ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

ওরা ব্যবসা করছে কেন? তার ফলে কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আমরা কেবল একটি ব্যবসাই করি, এবং সেটি হচ্ছে বই বিক্রির ব্যবসা। কর্মী হয়ে ব্যবসা শুরু করলেই পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়। এই ধরনের ব্যবসা করতে আর যেন অনুপ্রেরণা না দেওয়া হয়। সংকীর্তন না করে ব্যবসা করাটা
কোন মতেই ভাল নয়। সংকীর্তন করাটাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল, তবে কোন বিশেষ অবস্থায় গৃহস্থরা অন্য ব্যবসা করতে পারে, যদি তারা অন্তত লাভের অর্ধাংশ মন্দিরকে দেয়। তবে সংকীর্তনই হচ্ছে সব চাইতে ভাল ব্যবসা।
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং
রহূগণ উপধার্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রমত কিমিতি বিষমমুদ্যতে যানমিতি। (ভাগবত: ৫/১০/২)
জড় ভরত তাঁর অহিংস মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে তাঁর পায়ের চাপে কোন পিপীলিকার মৃত্যু না হয়। কিন্তু তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং রাজা রহূগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা কেন অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।"

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

ত্রয়োদশ বর্ষ ◗ তৃতীয় সংখ্যা ◗ জুলাই ◗ আগস্ট ◗ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ **শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী**

নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী জিতেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা

বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, [illegible] ডি আই জি ([illegible])
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী অনিল ঘোষ

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

আনুকূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক আনুকূল্য
রেজিঃ ডাকে – ১২০.০০টাকা

কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'

স্বামীবাগ আশ্রমঃ৭৯,৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০

ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৯১৭৫১৮৮২৭

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধু পান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রমুখ দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

নীলাচল-নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র-সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ॥

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ- ৫২২, বঙ্গাব্দ- ১৪১৪-১৫১৫, খ্রিষ্টাব্দ- ২০০৮

১৫ বামন, ১৮ আষাঢ়, ৩ জুলাই ২০০৮, বৃহস্পতিবার ঃ গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস) অমাবস্যা শুরু।

১৬বামন, ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই ২০০৮, শুক্রবার ঃ ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব। স্বামীবাগ-ঢাকা ইস্‌কন মন্দিরে ৯দিন ব্যাপী রথযাত্রা উৎসব, এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্‌কন মন্দিরে রথযাত্রা শুরু।

২৪ বামন, ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই ২০০৮, শনিবার ঃ ঢাকা স্বামীবাগ ইস্‌কন মন্দিরে উল্টো রথযাত্রা।

২৬ বামন, ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই ২০০৮, সোমবার ঃ শয়ন একাদশীর উপবাস।

২৭ বামন, ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই ২০০৮, মঙ্গলবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২১ মিঃ থেকে ০৮.১২ মিঃ মধ্যে।

৩০ বামন, ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই ২০০৮, শুক্রবার ঃ গুরু পূর্ণিমা (ব্যাস) শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ, (এক মাসের জন্য শাক বর্জন)।

১১ শ্রীধর, ১৩ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই ২০০৮, মঙ্গলবার ঃ কামিকা একাদশীর উপবাস।

১২ শ্রীধর, ১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই ২০০৮, বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২৭ মিঃ থেকে ০৯.৫২ মিঃ মধ্যে।

২৫ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট ২০০৮, মঙ্গলবার ঃ পবিত্রারোপিনী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।

২৬ শ্রীধর, ২৮ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট ২০০৮, বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩৩ মিঃ থেকে ০৯.৫৩ মিঃ মধ্যে।

২৯ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট ২০০৮, শনিবার ঃ ঝুলন যাত্রা সমাপ্ত। ভগবান শ্রীবলরামের আবির্ভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস), চাতুর্মাস্যের ২য় মাস আরম্ভ (একমাস দধি বর্জন), সিংহ সংক্রান্তি।

৮ হৃষিকেশ, ৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট ২০০৮, রবিবার ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (আবির্ভাব) জন্মাষ্টমী। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নির্জলা উপবাস। পরে অনুকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯ হৃষিকেশ, ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট ২০০৮, সোমবার ঃ শ্রী নন্দোৎসব। ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)

১১ হৃষিকেশ, ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট ২০০৮, বুধবার ঃ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

১২ হৃষিকেশ, ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট ২০০৮, বৃহঃবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩৯ মিঃ থেকে ০৭.২৫ মিঃ মধ্যে।

২৩ হৃষিকেশ, ২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮, সোমবার ঃ শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব। রাধাষ্টমী (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)

২৬ হৃষিকেশ, ২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, বৃহঃবার ঃ পার্শ্ব একাদশীর উপবাস।

২৭ হৃষিকেশ, ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮,শুক্রবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৪৪ মিঃ থেকে ০৯.৫১ মিঃ মধ্যে। ভগবান শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব ।একাদশীর দিনে উপবাস হয়েছে।

২৮ হৃষিকেশ, ২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮,শনিবার ঃ শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)

২৯ হৃষিকেশ, ২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮,রবিবার ঃ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)

১ পদ্মনাভ, ২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮, সোমবার ঃ চাতুর্মাস্যের ৩য় মাস শুরু, (এক মাসের জন্য দুধ বর্জন)।

৩ পদ্মনাভ, ৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮, বুধবার ঃ শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব (শ্রীব্যাস পূজা) বিশ্ব হরিনাম দিবস।

৭ পদ্মনাভ, ৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮, রবিবার ঃ শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় পদার্পণ।

১১ পদ্মনাভ, ৮ আশ্বিন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮, বৃহঃবার ঃ ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

১২ পদ্মনাভ, ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, শুক্রবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৪.৪৮ মিঃ থেকে ০৯.৪৯ মিঃ মধ্যে।

পঞ্চতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ

১৯৬৮ সালের ২৭ মার্চ আমেরিকায় স্যান ফ্রানসিস্‌কো শহরের স্টো হ্রদের ধারে প্রাতঃভ্রমণকালীন সংলাপ থেকে সংকলিত

-কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রভুপাদ ঃ সকলে জপ কর।

ভক্ত (১) ঃ শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, এই কীর্তন গানটি তুমি শিখে নাও।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ।।

আরতির সময়ে নৃত্য করে এই কীর্তন গাইবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তারিত করতে পারেন। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নন, সিদ্ধ যোগীমাত্রেই নিজেকে বিস্তারিত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো অত বেশি নয়। তবে শাস্ত্রাদি থেকে আমরা জানতে পারি যে, সিদ্ধ যোগীরা নিজেদের আট, এমন কি নয়টি রূপ পর্যন্ত বিস্তারিত করতে পারেন। সৌভরি মুনি নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি জলের নিচে যোগ চর্চা করতে পারতেন। নানা যোগী নানাভাবে তাঁদের যৌগিক সিদ্ধির ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারতেন- কেউ জলের মধ্যে, কেউ জলন্ত আগুনের মধ্যেও। তার অর্থ হল, স্বেচ্ছায় শরীরকে কষ্টের মধ্যে রাখতে পারার চর্চা এবং সেই সময়ে যোগ সাধনা করতে থাকা। তাঁরা যোগ সাধনায় এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত জড়জাগতিক কষ্ট সত্ত্বেও তাঁরা পারমার্থিক কর্তব্যগুলি ঠিক সম্পন্ন করে চলতেন।

এই সৌভরি মুনি জলের নিচে যোগসাধনা করার সময়ে মাছেদের খেলা করতে দেখে যৌন উত্তেজনা উপলব্ধি করেছিলেন বলে তিনি জল থেকে উঠে এসে এক রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।" রাজা ভাবলেন, একে দেখতে এত কুৎসিত! কারণ জল থেকে বহুদিন পরে মুনি উঠে এসেছেন, সর্বাঙ্গে তাঁর আগাছা শ্যাওলা সব জড়িয়ে ছিল। তা ছাড়া মুখভর্তি গোঁফ দাড়ি। রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, ইনি তো বিরাট এক যোগী। যদি আমি বলি, আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করব না, তা হলে মুনিবর ক্রুদ্ধ হয়ে মহা উৎপাত করতে পারেন। তাই তাঁকে পরিহার করার মতলবে রাজা তখন সৌভরি মুনিকে বলেছিলেন, "আমার আটটি কন্যা এবং তাদের ইচ্ছা যে, একজন মাত্র স্বামীর হাতে তাদের সকলকেই একযোগে সম্প্রদান করতে হবে এবং তা না হলে তাদের সকলকে এক সঙ্গে

বিবাহ দিতে হবে। তাই আমি সব কন্যার জন্যে স্বামীর সন্ধান করছি, আপনি তদ্দিন অপেক্ষা করুন দয়া করে।" তখন সৌভরি মুনি বললেন, "আমি যোগবলে নিজেই আটটি রূপে বিস্তারিত হচ্ছি।" আর তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, একই রকমের আটজন সৌভরি মুনি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! নিজেকে তিনি আট রূপে বিস্তারিত করেছিলেন তৎক্ষণাৎ।

এবার রাজা কি বলবেন? তিনি বললেন, "দেখুন মুনিবর, তারা তো স্ত্রীলোক, তার ওপর আবার রাজকন্যা। তারা আপনার মতো বড় বড় গোঁফ- দাড়িওয়ালা কোনও নোংরা লোককে বিবাহ করতে চাইবে কি?" বলা মাত্র, মুহূর্তেই মধ্যেই সৌভরি মুনির আটটি রূপই নতুন সাজে সেজে নব্য যুবক রূপে সকলের সামনে দেখা দিল। অপূর্ব তাদের রূপ! তখন তাঁর সঙ্গে ঐ আটজন কন্যার বিবাহ হয়ে গেল। আটজন সৌভরি-রূপী মুনির সাথে।

অতএব পৌরাণিক ইতিহাসে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সিদ্ধ যোগীরা নিজেদের এইভাবে নানারূপে বিস্তার করতে পারেন। ঠিক এইভাবেই, কর্দম মুনি নিজেকে ন'টি কর্দম মুনি রূপে বিস্তারিত করেছিলেন। তিনি দেবহূতিকে বিবাহ করেছিলেন এবং নিজেকে ন'টি কর্দম মুনি রূপে বিস্তারিত

করে দেবহুতির গর্ভে ন'টি কন্যা সন্তানের জন্মদান করেছিলেন।

পুরাণে এই সব কাহিনী আমরা পাচ্ছি। পুরাণ মানে প্রাচীন ইতিহাস। সিদ্ধ যোগীরা যদি এইভাবে নিজেকে বিস্তার করতে পারতেন, তো শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার কথা আর বলার কী আছে? শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তিনি হলেন 'যোগেশ্বর', সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথাগুলি আছে– 'যত্র যোগেশ্বর ঃ হরিঃ'। তিনি যোগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে বিরাজমান। যৌগিক বিদ্যার চরমে তিনি। তাই এই যে পঞ্চতত্ত্বের বিস্তার– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ– এই পাঁচটি রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আর প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর সাক্ষাৎ অংশ প্রকাশ। ঠিক যেন শ্রীবলরামেরই মতো। শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীবলরাম। আর অদ্বৈত প্রভু হলেন অবতার। আর গদাধর হলেন অন্তরঙ্গা শক্তি। আর শ্রীবাস হলেন তটস্থা শক্তি। এছাড়া ভগবানের আর একটি শক্তি রয়েছে, সেটি হল বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি ঐ পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে নেই। বহিরঙ্গা শক্তি মানে যা দিয়ে এই জড় জগৎটা প্রকাশিত হয়েছে।

জনৈক ভক্ত (২) ঃ অংশপ্রকাশ আর অবতার– এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি রকম?

প্রভুপাদ ঃ অংশপ্রকাশ হলেন প্রত্যক্ষ, আর অবতার হলেন পরোক্ষ। যখন অংশেরও অংশ প্রকাশিত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কলা'। তাই, শ্রীঅদ্বৈত প্রত্যক্ষ প্রকাশ নন। ব্রহ্মসংহিতায় এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। ঠিক যেমন প্রথমে একটা বাতি থেকে অন্য একটা বাতি জ্বালানো হল, আবার দ্বিতীয়টা থেকে আবার একটা বাতি জ্বালানো যাবে। তৃতীয়টার থেকে আবার একটা। তাই ঠিক তেমনি, ভগবানের অংশ প্রকাশ কিংবা অবতার, যাই হোক, সবই হল ঐ বাতির মতো। আদি বাতিটি হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভগবানের একটি বিস্তার রূপ থেকে অন্য একটি বিস্তার রূপে শক্তি যে কম থাকে, তা ঠিক কথা নয়। বাতির আলো সব কটিতেই সমান থাকে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষমতা মর্যাদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে কম কিছু নয়। যে কোনও অবতারের কিংবা অংশ প্রকাশেরই সমান শক্তি থাকে। তাঁকেই বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব। শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন। ঠিক যেমন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং শ্রীরামচন্দ্রও হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তবে একজন হলেন আদি পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ সেই আদি পরম পুরুষ এবং শ্রীরামচন্দ্র হলেন তাঁর বিস্তার। কেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের গুণগুলি পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের গুণগুলি ব্যক্ত করেছেন আংশিকভাবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখ– শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে আদর্শ রাজা রূপে অভিব্যক্ত করেছিলেন। তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে প্রকাশ করেননি। অতএব আদর্শ রাজা রূপে তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই এই জগতের নীতিবোধ নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন তিনি।

আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলেই জড় জগতের সব নীতির ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রকটিত করেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা কাজ করতে পারেন। তা না হলে পরম পুরুষের অর্থ কি হল? শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।

শ্রীরামচন্দ্র একমাত্র সীতা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। আর সীতাকে যখন রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যায়, তখন তিনি আর বিবাহ করেননি। তিনি একটা নীতিবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন, তাই একাধিক বিবাহ করেননি। কিংবা যখন সীতাকে বনে পাঠানো হল জনগণের সন্তুষ্টির জন্য, তখনও তিনি আবার বিবাহ করেননি। তিনি একটি নীতি ধারণ করেছিলেন এবং রাজা হয়ে জনগণকে একটা নীতি শেখাতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, শ্রীকৃষ্ণ ১৬,১০৮ টি বিবাহ করেছিলেন। এগুলি ধর্ম বিবাহ নয়। ধর্ম বিবাহ করেছিলেন মাত্র আটজন স্ত্রীকে। কিন্তু ঐ ১৬,১০০ জন কন্যাকে তিনি এক দানবের বন্দীত্ব থেকে রক্ষা করে ফিরিয়ে আনেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাঁদের উদ্ধারের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সবার প্রতি কৃপাময়। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন এবং সেই দানবটাকে বধ করেছিলেন। কিন্তু ঐ বন্ধনমুক্ত কন্যারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন করেছিলেন– "আমরা বন্দী হয়েছিলাম বলে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের বিবাহের সঙ্কট হবে। তাই আমাদের প্রার্থনা আপনি আমাদের সকলকে বিবাহ করে মান বাঁচান।" শ্রীকৃষ্ণ তাতে সম্মত হন এবং ১৬,১০০ কন্যাকেই বিবাহ করেন। আর সেটা খুবই সম্ভব। ১৬,১০০ কেন? তিনি এক সাথে ১৬ লক্ষ কন্যাকেও বিবাহ করতে পারেন। তা না হলে তিনি ভগবান হলেন কিভাবে?

পঞ্চতত্ত্ব কীর্তনের মর্ম বুঝতে হলে এইগুলি উপলব্ধি করা চাই। এই সবই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন রূপে, তাই পরমেশ্বরেরই অভিব্যক্তি রূপে তাঁদের প্রণতি জানাতে হবে।

ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে
সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তদের ভারতে আগমনের তাৎপর্য

-শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

১৯৭১ সালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন তাঁর মস্কো পরিভ্রমণের সময় একজন রুশ নাগরিককে কৃষ্ণভাবনামৃতে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ সোভিয়েতবাসী একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করবে, তখন সেটা এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তদের প্রথম দলটি এদেশে এসে পৌঁছল এবং রাশিয়ায় এখন হাজারে দশ জন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছেন– এমন সংবাদ পাওয়া গেল, তখন শ্রীল প্রভুপাদের একদা ভবিষ্যদ্বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো বাস্তবে।

বাস্তবিকই, সকল জাতি-ধর্মের ছোট-বড়ো প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে এসেছেন পারমার্থিক গুরু এবং জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্যের সন্ধানে। এই পৃথিবীর পরমার্থবাসের স্থান হচ্ছে ভারতবর্ষ। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও সে জননী। বিশ্বের মহান ভাষা সংস্কৃতিরও জন্মভূমি এই দেশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবাসীকে তার অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার॥

(চৈঃচঃ আদি ৯/৪১)

পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক ধর্মনেতারাই বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছেন পারমার্থিক জ্ঞানে নিজেদের অনুরঞ্জিত করতে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ১৮০০ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসনকালে মহান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন যে, আগামী শতকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবাণী পৌঁছে যাবে পশ্চিমী দুনিয়ার দুয়ারে। তিনি বলে ছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার জনসাধারণ একদিন কীর্তন করবেন। ঐ সকল দেশের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী ভক্তরা বাংলায় শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আসবেন এবং এখানকার আর্য ভাইয়েরা তাঁদের দুবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরবেন। পশ্চিমী দেশগুলোর ক্ষেত্রে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে অনেক আগেই। বাদ ছিল কেবল রাশিয়া। এবার রাশিয়ার প্রথম হরেকৃষ্ণ ভক্তের দল তথা প্রত্যেক সোভিয়েত প্রদেশের প্রতিনিধিরা ভারত-তীর্থে এসে সে ব্যতিক্রম ভেঙ্গে দিল। এই ঘটনায় ভারতবর্ষ যে সমস্ত বিশ্বের গুরু, তা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হল।

নিঃসন্দেহে ৫৯ জন সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তের পবিত্র ভারত-ভূমিতে আগমন তাঁদের সুদীর্ঘকালের পরিকল্পিত ভাবনারই ফলশ্রুতি। এটা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিঃ গরবাচভের উদার মনোভাব এবং 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' নীতির সফল রূপায়ণে। আর এর সাথে আছে সোভিয়েত কাউন্সিলের ধর্ম-মন্ত্রকের সহযোগিতা। তা না হলে সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তদের ভারত-দর্শন কখনই সম্ভব হোত না।

মাত্র এক বছর আগেও সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষ্ণ-ভাবনামৃত আন্দোলন ছিল গোপন আন্দোলন। প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনার তো কোন প্রশ্নই ছিল না। এই তো সেদিন ১৯৮৮ সালের মে মাসে সোভিয়েত সরকার হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার কর্তৃক ব্যাপক অভিযান ও তল্লাসী,

এবং সোভিয়েত হরেকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে আপীল আবেদনের পরও, শাসকবর্গ তাঁদের মধ্যে ত্রিশ জনেরও অধিককে শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের জন্য, কারাগারে, মানসিক হাসপাতালে, অথবা শ্রমশিবিরে প্রেরণ করেছিল (বর্তমানে ভারতে আগত সোভিয়েত ভক্তদের অনেকেই এই নির্যাতিত দলের অন্তর্গত)। এক বৎসর পূর্বে সোভিয়েত দেশে জনসমক্ষে যেখানে হরিনাম কীর্তন করা কল্পনারও অতীত ছিল, সেখানে তাঁদের কাছে ভারতবর্ষে ভগবানের পবিত্র স্থানে তীর্থভ্রমণ করা এক অসম্ভব বাসনা বৈ কি! ১৯৮৮-এর মে মাসের ঘটনা ছিল তাদের কাছে অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সাফল্যের সর্বোত্তম শিখরে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই যে আনন্দের তৃপ্তি তাঁরা অনুভব করেছেন, তা সেইভাবে অপর কারুর পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব; নিঃসন্দেহে সমগ্র জগৎ তাঁদের নবলব্ধ সুখ ও আনন্দ লাভে অংশ গ্রহণ করবে। সচরাচর বিদেশ থেকে আগত কৃষ্ণভক্তদের আগমন ও পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তদের ভারতে তীর্থভ্রমণ অবশ্যই অভূতপূর্ব এবং অধিকতর মনোগ্রাহী। সোভিয়েত দেশে সুবৃহৎ মন্দিরের দর্শন ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গ লাভ (অন্যান্য দেশে যা লভ্য) একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এখন এই পরিবর্তনের ফলে সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তবৃন্দ অবশ্যই গোপন আধ্যাত্মিক প্রচার সংগঠন থেকে প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচারে সক্রিয় হবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের আশ্রয়স্থল ভারতবর্ষে আসতে চেয়েছিলেন পারমার্থিক অনুষ্ঠান, বিবিধ উৎসব, বিশাল মন্দির নির্মাণের কলাকৌশল শিক্ষালাভ করতে– বাস্তবিকপক্ষে সমস্তকিছুই যা তাঁদের সোভিয়েত দেশে পারমার্থিক জীবনের অগ্রগতির পথে অত্যাবশ্যক। ভারতে আগত এই সোভিয়েত হরেকৃষ্ণ ভক্তরা হাজারো জনতার মাঝে তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে সেদেশের লক্ষাধিক রুশ নাগরিকের কাছে জীবনের রহস্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত বাণীকে এবার পৌঁছে দিতে পারবেন। তাই বলা যেতে পারে, সোভিয়েত হরেকৃষ্ণ ভক্তদের ভারত আগমনের ঘটনাটা তাঁদের কাছে যেন এক 'অভিষেক'– বিশাল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাগরে পূত সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক সম্পদের স্পর্শলাভ। সোভিয়েত ভক্তদের কাছে এটা তাঁদের পারিবারিক পুনর্মিলন উৎসব, যেটা এতদিন তাঁদের কাছে শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তবে মিলিত হবার সুযোগ আসে নি– আজ এতদিন পরে শেষ হল তাঁদের প্রতীক্ষার দিনগুলি। আর দিন শেষে তাঁরা পেলেন পবিত্র ভারতভূমির বহু আকাঙ্খিত স্পর্শ।

এই সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তরা পেশাদারী ধর্মপ্রচারক নন; স্বদেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনকাঠামোয় তাঁরা কেউ কারখানার কর্মী, কেউ সৈনিক, কেউ শিল্পী, কেউ সম্পাদক, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ ছাত্র, আবার কেউবা হলেন সংসারের গৃহিণী। তথাপি জাতি বা পেশাগত এই পরিচয় ছেড়ে তাঁরা আপামর মানুষের কাছে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভগবানকে ভালোবাসার বিজ্ঞানসম্মত পন্থাকে প্রচার করার মহান ব্রতে তাঁরা আজ ব্রতী। একাজে কঠিন পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে তাঁদের; পারমার্থিক সত্যকে বাস্তবে উপলব্ধি করার ভেতর দিয়ে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়েছে তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস। সরকারী বাধাও এখন আর নেই। পাল্টে গিয়েছে তাঁদের পূর্বতননীতি সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই ভারত-তীর্থে আগমন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিশ্বাস ও অনুরাগের দৃষ্টিতে তাঁরা দেখলেন ভারতবর্ষকে। এখন ভারতবাসীদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের বাহু প্রসারিত করে ভাই-বোন জ্ঞানে তাঁদেরকে কাছে টেনে নিয়ে ভালোবাসার হৃদয় বৃত্তিকে প্রকাশিত করা। এই ঘটনায় সোভিয়েত রাশিয়া ও রুশ জনগণের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হল।

ভারতে সোভিয়েত কৃষ্ণভক্তরা যে অভিজ্ঞতা, যে শিক্ষা, যে প্রেম এবং ভালোবাসা লাভ করলেন, তা জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইলো তাঁদের কাছে। এখন তাঁরা স্বদেশে কৃষ্ণ-মন্দিরে এই বৈদিক জ্ঞান ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারবেন। এই অভিজ্ঞতা সোভিয়েত জনগণের আপৎকালীন সাহায্যের ক্ষেত্রে তাঁদের শক্তি যোগাবে, যেমনটা আর্মেনিয়া ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকার ক্ষেত্রে হয়েছিল। (এই সময় কৃষ্ণভক্তরা আর্মেনিয়ায় শিবির স্থাপন করে সেখানকার দুর্গত মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করেন। এই সময় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় দু-মাস ধরে এই ত্রাণকার্য চলেছিল)। ভারতীয় কৃষ্ণভক্তরা শতাধিক ফুলের মালা দিয়ে সোভিয়েত ভক্তদের স্বাগত জানান। স্বদেশে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যে সৎসাহস, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আত্মোৎসর্গতা ও সাধুতার পরিচয় সোভিয়েত ভক্তরা দিয়েছেন, এটা হোল তাঁদের সেই ত্যাগ-ব্রতেরই স্বীকৃতি। সকল ভারতবাসীরা এই বলে তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো উচিত,– "ভারতে আপনাদেরকে স্বাগতম! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং অসংখ্য

অবতার, মহর্ষি ও সাধুসন্তের দেশে আপনাদেরকে স্বাগতম।"

তাই এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ভারতের কৃষ্ণভক্তরা চান না যে, সোভিয়েত ভক্তরা শুধু একটু স্মৃতি নিয়েই স্বদেশে ফিরে যান। তাঁরা তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন মৃদঙ্গ, করতাল, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ উপহার সামগ্রী যাতে ফিরে গিয়ে ভারতের প্রেম ও মৈত্রীর বাণীকে তাঁরা আরোও ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারেন। তাঁদের ধুতি-শাড়িও দেওয়া হয়েছে, যাতে এই পোষাকাদি পরে রাস্তায় বেরিয়ে এদেশের সংস্কৃতিকে প্রচার করতে পারেন। আসুন, 'অতিথি নারায়ণ' সেবায় আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই। এই সোভিয়েত ভক্তরা যখন স্বদেশে ফিরে যাবেন তখন তাঁরা ভারতের শাশ্বত শান্তির বাণীকে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচার করবেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে, যে অভিজ্ঞতা তাঁরা পবিত্র ভারত-ভূমিতে এসে সঞ্চয় করে গেলেন।

(৮ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের রূপটি জড় হওয়ার ফলে তা অনিত্য অর্থাৎ একসময় তা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবানের রূপটি নিত্য, শাশ্বত। ভগবানের রূপ অবিনশ্বর। তাঁর রূপ নিত্য বর্তমান, চিন্ময়। নর লীলায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ১২০ বৎসর। একজন সাধারণ মানুষের ১২০ বৎসর বয়স হলে কি অবস্থা হয়! চুল পেকে যায়, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়ে ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের তেমন হয় না। কেননা তিনি হচ্ছেন শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়ত প্রকাশং। তিনি নিত্য নবীন। তাঁর রূপটি একজন নব-কিশোরের রূপ। একজন কিশোর যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করছে, ১৫-১৬ বৎসরের সেই রূপ। সেটিই হচ্ছে ভগবানের নিত্য রূপ। এবং তিনি হচ্ছেন গোবিন্দং আদিপুরুষ বা পুরাণ পুরুষ। কিন্তু তাই বলে তাকে কেউ বৃদ্ধ রূপে কল্পনা করে না। পাশ্চাত্য জগতে খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে ভগবানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে সর্বশক্তিমান, পরম পিতা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোথাও রূপের বর্ণনা করা হয়নি বা পাওয়া যায়নি। ফলে মধ্যযুগে রেঁনেশাসের সময় পাশ্চাত্যের শিল্পীরা যখন পরম পিতা রূপে ভগবানের ছবি এঁকেছিলেন, ভগবানকে সাদা চুল দাড়ি সম্পন্ন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রূপে দেখানো হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল যেহেতু তিনি সকলের পরম পিতা, তাই তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন চির নবীন। ব্রহ্মসংহিতাতে ভগবান কেমন, স্পষ্টভাবে তার সুন্দর বর্ণনা রয়েছে–

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম।
কন্দর্পকোটি কমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তিনি বেণুবাদন করছেন, তাঁর চোখদুটি পদ্মফুলের পাঁপড়ির মতো আয়ত, তাঁর মাথায় ময়ূরের শিখিপুচ্ছ, তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জল ভরা মেঘের মতো, এবং কোটি কোটি কন্দর্পকেও তাঁর সৌন্দর্য মোহিত করে, এমনই তাঁর রূপ। এটিই তাঁর নিত্য স্বরূপ।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

-শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

বৈকুণ্ঠে নারায়ণের যে রূপ রয়েছে সেটি দ্বিভুজ নয়, সেটি চতুর্ভুজ। কিন্তু বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ সেটি দ্বিভুজ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিভুজ রূপটিই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করে যে নারায়ণ রূপটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ আর কৃষ্ণ রূপটি হচ্ছে তাঁর অবতার। অথচ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে আমরা অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপটি তাঁর অবতার রূপ নয়। সেটি পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ। যেমন দশাবতার স্তোত্রমের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে–

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

অর্থাৎ, 'হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! প্রলয়কালে যখন বেদরাশি সমুদ্রজলে ভাসমান হয়েছিল, তখন আপনি মীন শরীর ধারণ করে অক্লেশে নৌকার ন্যায় সেই বেদরাশি ধারণ করেছিলেন। মীন শরীরধারী আপনার জয় হোক।

অতএব এখানে আমরা দেখতে পারছি যে, কেশব, মীন শরীরটি ধারণ করেছিলেন। দশাবতার স্তোত্রমের প্রতিটি শ্লোকেই 'কেশব ধৃত' বলা হয়েছে। যেমন 'কেশব ধৃত কূর্মশরীর', কেশব ধৃত শূকররূপ','কেশব ধৃত নরহরিরূপ' ইত্যাদি। এইভাবে পরপর বামন, পরশুরাম ও রামচন্দ্রের পর অষ্টম অবতারে বলা হয়েছে 'কেশব ধৃত-হলধর রূপ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নয়, বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে আমরা দেখতে পাই যে ২২জন অবতারের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে অসংখ্য নদী যেমন সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার সমুদ্রেই লীন হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছে। যেহেতু দশাবতার স্তোত্রমে দশজন অবতারের বর্ণনা রয়েছে তার মানে এই নয় যে দশজনই অবতার রয়েছেন। একটু মনোযোগী হয়ে বিচারপূর্বক অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পারব যে শ্রীমদ্ভাগবতে ২২জন অবতারের বর্ণনা পরের শ্লোকেই বলা হচ্ছে যে ভগবানের অসংখ্য অবতার। অবতারা হ্যসংখ্যেয়া। এবং পরপরেই বলা হয়েছে যে–

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

(ভাগবত ১/৩/২৮)
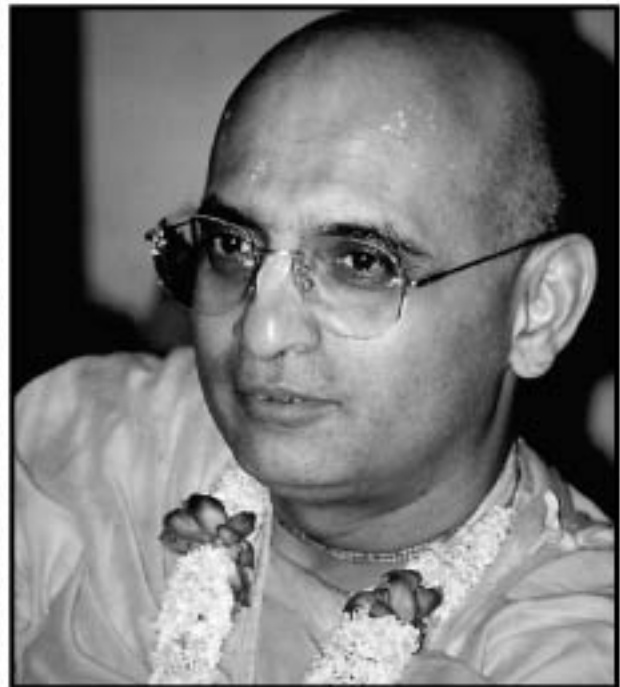
অর্থাৎ "এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ বা কলা অবতার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।" এইভাবে শাস্ত্রে বারে বারে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপটিই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।–

কৃষ্ণের যতেক খেলা তার মধ্যে নরলীলা
নর বপু তাহার স্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা রয়েছে, তার মধ্যে নররূপে তাঁর যে লীলা অর্থাৎ দ্বিভুজরূপে তাঁর যে লীলা, সেটি সর্বোত্তম। কেন? কেননা মানুষের মতো তাঁর এই যে দ্বিভুজ রূপ, সেটি তাঁর স্বরূপ। এখানে মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপটি মানুষের মতো নয় বা মানুষের থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই রূপটি ধার করেননি, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে মানুষদের এই দ্বিভুজ রূপটি দান করেছেন। কৃষ্ণের রূপের সঙ্গে মানুষের রূপের পার্থক্যটি কি? আমাদের এই রূপটি হচ্ছে জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী। অর্থাৎ পঞ্চ ভূতাত্মক-মাটি, জল, আকাশ, বায়ু ও আগুন দিয়ে তৈরী। কিন্তু ভগবানের রূপটি হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব মহোৎসব

-শ্রী সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্র যোগে সোমবারে মধ্যাহ্ন কালে শ্রীগোকুল মহাবনের নিকটবর্তী রাবল নামক গ্রামে শ্রীবৃষভানুরাজার গৃহে শ্রীমতি কীর্তিদা দেবীর কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি লীলাময়ী শ্রীশ্রীমতি রাধারাণী সর্বদিকে উজ্জ্বল আনন্দ বিস্তার করে আবির্ভূত হন।

তাঁর আবির্ভাব কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋষিগণ, চতুর্দশ মনু, চারি বেদাদি সর্বশাস্ত্র নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করে, নিজ নিজ বাহনে, পারিষদবর্গের সঙ্গে, নিজ নিজ অস্ত্রাদি সমন্বিত হয়ে, স্বীয় বসন ভূষণ অলংকারে অলংকৃত হয়ে আকাশের উপরিভাগে এসে উপস্থিত হলেন।

গন্ধর্বগণ নানাবিধ বাদ্য বাজাতে লাগলেন, অপ্সরাগণ সুমধুর সুরে গান করতে লাগলেন, নর্তক-নর্তকীগণ নানা ছন্দ-তালে নৃত্য করতে লাগলেন, মুনিগণ স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন, দেব-দেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। সিদ্ধগণ যশোগাথা গাইতে লাগলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। শ্রীরাধার জন্মমুহূর্তে চতুর্দিকে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হতে লাগল। শ্রীরাসেশ্বরীর আগমনে ত্রিজগৎ আনন্দময় হয়ে উঠল। এই পৃথিবী ধন্য হল। বৃষভানু রাজার মিত্র গোপগণ শিশুকন্যার জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দভরে দলে দলে দধি, দুধ, ননী, মাখন সহ নানা উপঢৌকন নিয়ে আগমন করতে লাগলেন। গোপাঙ্গনাগণ পতিদের সঙ্গে সদ্যজাতা শিশু রাধার জন্য পাটের বসন, সোনার হার, শাঁখা, চরণের নূপুর, কটির কিঙ্কিনী, মাথার চন্দ্রক, কন্ঠের মুক্তামালা, কানের কুণ্ডল প্রভৃতি যৌতুক এবং বিবিধ মিষ্টান্নাদি নিয়ে দলে দলে আসতে লাগলেন। তাঁদের মুখে সুস্মিত কলধ্বনি ও তাঁদের চরণের রুনুঝুনু শব্দ সর্বত্র শোনা যেতে লাগল।

কে মানুষ, কে দেব-দেবী– কিছুই বোঝা যায় না। কারা সব আসছে, কারা সব হাসছে, চতুর্দিকে সুসজ্জিত হয়ে বহুজন দলে দলে কেবল শিশু কন্যা রাধাকে দর্শন করার জন্য সমবেত হচ্ছে।

সূতিকা মন্দিরে মা কীর্তিদা শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। দলে দলে লোক এসে বলছে– "কী সুন্দর! কি মধুর!! এরকম কন্যা দেখিনি!!" ধাত্রীগণ বলছেন– "হে সুহাসিনী কীর্তিদা, কী অদ্ভুত ব্যাপার! দেখ, তোমার কন্যার হাতে-পায়ে শুভ চিহ্ন রয়েছে। এগুলি অবশ্যই মহা সৌভাগ্য চিহ্ন!"

শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মতলে উনিশটি শুভ রেখা রয়েছে। তাঁর বাম চরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, পদ্ম, উর্ধ্বরেখা, অঙ্কুশ, অর্ধচন্দ্র ও যব–এই এগারোটি দিব্য চিহ্ন বিদ্যমান, এবং তাঁর দক্ষিণ চরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্বত ও শঙ্খ– এই আটটি চিহ্ন বিরাজ করছে।

সমস্ত গোপ-গোপীগণ আনন্দভরে আঙ্গিনার মধ্যে দধি-দুধ, সুগন্ধি তেল, হলুদজল সিঞ্চন করতে করতে নৃত্যগীত করতে লাগলেন। সকলে বৃষভানু রাজার মহিমা গান করতে লাগলেন। শ্রীবৃষভানু রাজা সমবেত অতিথিদের সকলেই বিবিধ বস্ত্র, রত্ন, অর্থ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে লাগলেন। দেব-দেবীগণও ছদ্মবেশে বৃষভানুরাজার আনন্দময়ী কন্যার জন্ম-মহোৎসবে এসে ভোজন এবং আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু এত আনন্দ ও ধুমধামের মধ্যেও প্রায় সকলেরই মনে একটি প্রশ্ন ছিল– তা হল, বৃষভানুরাজার সেই অতি সুন্দর শিশু কন্যাটির চক্ষু কেন ফোটেনি? বিশেষ করে নিমীলিত নয়না কন্যার জন্য মা কীর্তিদা মর্মাহত হয়ে বিধাতার প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করতে থাকেন। পরদিন মা কীর্তিদা তাঁর কন্যার ভবিষ্যৎ বিষয়ে জানবার জন্যে আকুল আগ্রহে মহাযোগিনী শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। পৌর্ণমাসী হচ্ছেন সান্দীপনি মুনির মাতা। তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানা লক্ষণ বলে ব্রজবাসী সকলকে সৎ পরামর্শ দেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা ও সবার পূজনীয়া। তিনি যখন রাধাকে দর্শন করতে এলেন, তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'এ তো রাসেশ্বরী এসেছেন।' তিনি বলতে লাগলেন, "হে ভানু! হে কীর্তিদে! এই কন্যা সর্বলক্ষীময়ী ও বৈকুন্ঠের মহালক্ষীরও অংশিনী। এই কন্যা গোলোক, ভূলোক, সর্বলোকের ঈশ্বরী। এঁর পাদপদ্ম যুগল ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, মরুত, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণও নিত্য স্তুতি করে থাকেন। শ্রীহরি যেমন স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তেমনই এই কন্যাও স্বেচ্ছায় তোমাদের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন, এই কন্যার দর্শনে, স্পর্শে, পূজনে

সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়ে থাকে। ইনি কোনও নিগূঢ় লীলা বিলাসের জন্য অধুনা অবতীর্ণ হয়েছেন। এর অঙ্গত্ব যথাসময়ে উন্মোচিত হবে। তোমরা একে সাবধানে যত্নের সঙ্গে পালন করো।"

তারপর শিশুকন্যার মাতাপিতার কাছে পৌর্ণমাসী দেবী যথোচিত পূজিতা হয়ে নিজ আশ্রমে প্রস্থান করলেন। সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণা কন্যাটিকে দেখবার জন্য গোকুলের রমণীরা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের কোলে নিয়ে কীর্তিদা-ভবনে আসতে লাগলেন। মা যশোদা তাঁর শিশুপুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে এসেছিলেন। অত্যন্ত চঞ্চল বালক কৃষ্ণ শিশু রাধার নিমীলিত চক্ষুতে কোমল করকমল স্থাপন করলে রাধার চক্ষু উন্মীলিত হয়। এই ঘটনা সকলেই অদ্ভুতভাবে অশেষ আনন্দ দান করেছিল। নয়ন উন্মীলিত করে রাধা প্রথমেই কৃষ্ণকে দর্শন করল। মা যশোদা কীর্তিদার কন্যা রাধাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন, তা দেখে বালক কৃষ্ণ কাঁদতে শুরু করল। তাই মা যশোদা এক কোলে রাধা ও অন্যকোলে কৃষ্ণকে নিলেন। তখন দুই অপূর্ব রূপমাধুরী সম্পন্ন শিশু পরস্পর পরস্পরকে মিটিমিটি করে তাকাতে লাগল, আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হাসতে লাগল। তাঁদের ভক্তবৃন্দ বুকভরা উল্লাসে মেতে উঠলেন। ভগবান শ্রীহরি ও তাঁর হ্লাদিনীশক্তির আবির্ভাবে এই ধরাধাম ধন্য। তাঁদের সেবায় যুক্ত ভক্তগণ ধন্য, তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা এই মনুষ্য জন্মে তাঁদের অভয় পাদপদ্ম যুগলে মতি রেখে শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠন করতে পারি।

(১১ পৃষ্ঠার পর)

দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, "শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন"– এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক "হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদিগের জয় হউক! জয় হউক!" বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐদিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য জন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবসই শ্রীজগদীশকে অধিবাস পুরঃসর মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নান অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভারত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে জগদীশ জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন, সিন্ধুকূলে যে অক্ষয় বট আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকা-রাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিকপালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে বলি প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের-সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজিও শ্রীপুরুষোত্তমে এইরূপভাবে শ্রীস্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরিদৃষ্ট হয়। ফলশ্রুতি পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নান-যাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানযজ্ঞে শ্রীজগদীশের স্নানসেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না:–

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বান পশ্যেত কদাচন॥"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে **"অনবসর কাল"** বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন।
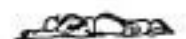
শ্রীস্নানযাত্রা

-শ্রী মাধব মুরারী দাস ব্রহ্মচারী

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগদীশের স্নানযাত্রা- মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহান্তি' বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যেস্থানে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত "জয় জগদীশ" বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যেস্থান নানা তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যেস্থান দক্ষিণানিল সংস্পর্শে সুশীতল, যেস্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেই রূপ সুপরিস্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ ভগবানকে স্নাত ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া ভগবানের শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা কালে মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরকতমণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্তমান স্নানবেদী নির্মান করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্বক শ্রীজগদীশকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পহান্তিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরু-গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগদীশের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন সেবোন্মুখের না মানস-মহোৎসব সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ বসুদেবগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে, অনবধানতাপ্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে,- এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে

(বাকি অংশ ১০পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ

-শ্রীল ভক্তি কিঙ্কর শ্রীধর মহারাজ

অর্জ্জুনের বড় অহংকার আমিই সখার একমাত্র ভক্ত। তাঁহার এই অভিমান চূর্ণ করিবার মানসে ভগবান এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন এবং অর্জ্জুনকে ধারণ করাইলেন বালকের বেশ। অতঃপর তাঁহারা যখন রাজা মৌরধ্বজের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বারী আসিয়া যখন অতিথিগণের আগমন বার্তা রাজ সমীপে নিবেদন করিল, তখন রাজা অতিথিগণকে সাদর অভ্যর্থনা সহ আপ্যায়ন করিবার জন্য দ্বারীকে আদেশ দিলেন। রাজার এইরূপ নির্দ্দেশ শুনিয়া অতিথিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রত্যাগমনে উদ্যত হইলে রাজা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পূর্ব্বকৃত অনিচ্ছাঘটিত ত্রুটির কথা জানাইয়া অতিথিগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া মনস্তাপ করিলে পর অতিথি তুষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণঃ... রাজন! তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে যদি আমার অভিলাষ পূরণ করিতে অঙ্গীকার কর তবে বলিব।

রাজাঃ... আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন।

ব্রাহ্মণঃ... আমি যখন বনপথ ধরিয়া আসিতেছিলাম; তখন এক সিংহ এই শিশুটিকে খাইতে ইচ্ছা করে। শিশুর প্রাণ বাচাইবার জন্য আমি সিংহকে অন্য কিছু চাহিতে এবং তাহা আমি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিব এইরূপ অঙ্গীকার করায়–সিংহ বলিল যদি রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক সেই খণ্ডিত মাংস আমাকে আনিয়া দিতে পার এবং যদি রাজা তাহা অকাতরে দান করেন তবেই শিশু রক্ষা পাইতে পারে। এক্ষণে আমি যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি তজ্জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। ব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণে রাজা হৃষ্টচিত্তে বলিলেন... আমার নশ্বর দেহ তো একদিন ভস্মীভূত হইবেই, তাহা যদি তৎপূর্ব্বে পরোপকারে ব্যয়িত হয় তজ্জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়া আনন্দিত। আমি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থে আমার এ অনিত্য দেহ এখনই দান করিতে ইচ্ছুক।

ব্রাহ্মণঃ... তোমার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য তোমার স্ত্রী ও পুত্র নিযুক্ত হইবে, তাহারাই ছেদনে ব্যবহৃত করাতটির উভয়দিক টানিয়া দেহ ছেদন করিবে।

অতঃপর রাজাদেশে তাঁহারই স্ত্রী-পুত্র, তাঁহার দেহ ছেদন করিবার জন্য করাত টানিবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে পর,

কর্তনরত অবস্থায় করাতটি যখন নাসিকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল তখন রাজার চক্ষু হইতে সহসা মাত্র একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কুপিত হইলেন। বলিলেন... কাতর হইলে উক্ত দেহাংশ আমি গ্রহণ করিব না।

প্রত্যুত্তরে রাজা বলিলেন... ঠাকুর আমার অঙ্গচ্ছেদনের জন্য আমি কাতর নহি, শুধুমাত্র আমার দেহের অর্দ্ধাংশ আপনার কাজে লাগিল, অপর অর্দ্ধাংশ বৃথাই গেল তজ্জন্যই আমার এই মনস্তাপ। এ ছাড়া আমার দুঃখের কোন কারণ নাই।

রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের অপরূপ রূপ দর্শন করাইলে পর শ্রীভগবানের শুভ দৃষ্টিতে রাজার ছেদিত দেহ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল। পরমত্যাগী রাজা যখন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পতিত হইলেন তখন শ্রীভগবান্ রাজাকে বলিলেন... রাজা আমি তোমার চরিত্র পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম।

রাজা কহে প্রভু মোর এক বর দিবে।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে॥

এতদ্দর্শনে অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি ভগবানের চরণে পতিত হইয়া সাধারণের কি কথা বিজ্ঞেও বুঝিতে পারে না। এই ভাবে অহঙ্কারচূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন।

“অপরাধ শূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ নাম”

কৃষ্ণনাম চিন্ময়। চিন্তামনি। রসের খনি। রসো বৈ সঃ। চৈতন্যরসবিগ্রহ। কৃষ্ণনাম কেবল দু'টি বর্ণাকৃতি নয়–তা অমৃত স্বরূপ। অমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। মানবের জীহ্বায় কীর্ত্তিত হবারকালে তা বর্ণাকারে উচ্চারিত হয় মাত্র। বর্ণ নয়। এটিই কৃষ্ণনামের অপ্রাকৃতরহস্য। নাম এবং নামী অভেদাত্মক। নামী কৃষ্ণ তাঁর 'কৃষ্ণ' নামে সর্বশক্তি অর্পন করেছেন। নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা। নাম তাই রসময়। মধুময়। নামের মহিমা নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা। নাম সুধাময়।

কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম॥

শুধু তাই নয়। কৃষ্ণনাম কলিকল্মষনাশনম্। কলি জীবের পাপ বিনাশকারী মহৌষধ। জীবের পুঞ্জীভূত পাপের স্খালন করতে কৃষ্ণনাম যে ক্ষমতা রাখে এমন ক্ষমতা সম্পন্ন উপায় আর চারি বেদেও নাই। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু। এমনকি হেলাভরে, তাচ্ছিল্যের ছলে নামগ্রহণ কারী ব্যক্তিও কৃতার্থ হন। নাম নরমাত্রকে পরিত্রান করে। নরমাত্রং তারয়েৎ। নাম জীবের পরম বন্ধু। নামই জীবন। নামৈব জীবনম্। সিংহনাদে ভীত-ত্রস্ত মৃগগন যেমন প্রাণভয়ে পলায়ন করে তেমনি সর্বপাপকারী ব্যক্তিরও পাপ কৃষ্ণনামে হাহাকার করে পলায়ন করে। সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥ স্বয়ং কলি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। ন হি তান্ বাধতে কলিঃ। কৃষ্ণনাম গ্রহনকারীর সর্বকর্মকৃত হয়। তাদের ঋক, যজু সামাদি বেদপাঠেও কোন প্রয়োজন নাই। মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পাঠকিঞ্চন। যারা বিষয় প্রমত্ত সদাকামে মত্ত, পরদ্বেষক, জ্ঞানবৈরাগ্য রহিত, ধর্মাচারবর্জিত, সর্বপাপানুরক্ত এবং যে সকল মানবের আর অন্যকোন গতি নাই, ছিন্নমূল, তারাও কৃষ্ণনাম গ্রহনে যে গতিলাভ করে সমুধায় ধার্মিক মিলিত হয়েও সেই গতিলাভ করতে পারেনা। এটিই শাস্ত্রের অভিমত। যাংগতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ। শাস্ত্র আরও ঘোষণা দেয়–

বিষ্ণোরেকৈকং নামাপি সর্ববেদাধিকংমেতম।
তাদৃক্নামসহস্রেন রামনামসমং স্মৃতম্ ॥

ভগবান বিষ্ণুর একটিনাম সর্ববেদাধিক। বিষ্ণুর এরূপনাম একহাজার বার নিলে একবার 'রাম' নামের তুল্য। অর্থাৎ একবার 'রাম' নাম করলে একহাজার বিষ্ণুনামের সমান হয়। আর ব্রহ্মাণ্ড পুরান শাস্ত্র জানায় একবার 'কৃষ্ণ' নাম গ্রহনে তিনবার 'রাম' নামের সমান হয়। তারমানে একবার 'কৃষ্ণ' নাম সমান তিন হাজার 'বিষ্ণু' নামের সমান হয়।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

জ্ঞাতব্য এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, এতশক্তিশালী কৃষ্ণনাম গ্রহনেও কতিপয় প্রতিকূলতা বিদ্যমান। এ প্রবন্ধে সেইসব প্রতিকূল বিষয় সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পাপ এবং অপরাধ ধর্মীয় ব্যাখ্যায় দু'টো পৃথক জিনিস। পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা এসবই জীবের ক্লেশ। সুনীতি বিগর্হিত কার্যকলাপই পাপ। এবং পাতক, মহাপাতক আর অতিপাতক প্রকৃতি কার্যকলাপই পাপ। পাপ করার বাসনা 'পাপবীজ' এবং জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস এ সম্বন্ধ বিস্মৃতির নাম 'অবিদ্যা'। জীব হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয়ে ঐ তিনপ্রকার ক্লেশই বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যাতিমির বিনাশ হয় কৃষ্ণনামে। কিন্তু অপরাধ ধেনু বৎস্য যেমন গাভীকে অনুসরণ করে তেমনি অপরাধ অপরাধীর পিছনে সর্বদাই ধাবমান থাকে। অপরাধ হচ্ছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা। উষর বালুচড়ে বীজবপনে যেরূপ ফলাকাঙ্খা বৃথা তেমনি অপরাধীর কৃষ্ণে প্রেমাকাঙ্খা বৃথা। অপরাধীর চিত্তে কৃষ্ণনামের প্রেম অঙ্কুর হয় না। পাপ এবং অপরাধ এই দুয়ের অপেক্ষা কঠিন–নাম অপরাধ। সর্বপ্রকার পাপ এবং অপরাধ নিরন্তর কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে বিদূরিত হলেও নামাপরাধ তত সহজে বিদূরিত হয়না। নামাপরাধ বর্জন করে শ্রীনাম না করলে স্বয়ং নামও নামাপরাধ যুক্ত নামগ্রহনকারী ক্ষমা করেন না। নামাপরাধ পারমার্থিক প্রগতির পথে এক মহাপ্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক আবার দুই প্রকার। সামান্য এবং বৃহৎ। প্রতিবন্ধক সামান্য থাকলে 'নামাভাস' হয় এবং প্রতিবন্ধক বৃহৎ থাকলে কীর্তিত নাম 'নামাপরাধ' হয়। নামাভাসে বিলম্বে ফল প্রসব করে। কিন্তু নামাপরাধীর অবিশ্রান্ত নাম গ্রহন ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি– অর্থাৎ নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহনে নামাপরাধ বিগত সম্ভব।

আর একটি সুক্ষ্ম বিষয় জানা কর্তব্য। কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণ স্বরূপের কোন প্রভেদ নাই সত্য, তবে একটি তাত্ত্বিক রহস্য আছে। তা'হল কৃষ্ণের 'স্বরূপ' অপেক্ষা তাঁর 'শ্রীনাম' সর্বাধিক কৃপাময়। স্বরূপের প্রতি অপরাধ হলে 'স্বরূপ' তা কখনও ক্ষমা করেন না। কিন্তু 'স্বরূপ' এবং নিজের প্রতি অপরাধ হলে কৃষ্ণনাম করুনাপরবশ হয়ে তা ক্ষমা করেন। তাই নামাপরাধ শূন্য হয়ে নাম গ্রহন করলে অতিশীঘ্র

ভক্তাকাশে কৃষ্ণসূর্যোদয় ঘটে। তখন ভক্ত নির্মল চিত্তের অধিকারী হতে পারে। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে হৃদয়ে নির্মল হয় তার। পদ্মপুরান স্বর্গখন্ডের ৪৮ অধ্যায় ও স্নাতকগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধে এবং ভক্তিরাজ্যের স্নাতকোত্তর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবিধলীলায় আর শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতেও নামাপরাধ বিষয়ে উল্লেখ আছে। নামাপরাধ কি এবার তা বিস্তারিত জানা যাক।

যাঁরা গৌড়ীয় ধারায় চালিত এমন সুধীজন সকলেই কমবেশী নামাপরাধ অবগত আছেন। ব্রহ্মমুহূর্তে মঠাশ্রমগুলোতে এ নিয়ে আলোচনাও হয়। তথাপি কোন কোন সুধীজনের শ্রীমুখে নামাপরাধমূলক কথাবার্তা শোনা যায়। তাই এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় ব্রতীহয়েছি। যারা কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন না তাদের অবশ্য নামাপরাধ নিয়ে মাথাব্যাথা থাকার কথা না। তবু সচেতন হওয়া কর্তব্য। যাতে অপরাধের মাত্রা বেড়ে গগনচুম্বী না হয়। কৃষ্ণনাম গ্রহনকারী সাধুবেশী ব্যক্তিদেরই নামাপরাধ বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। সাধু সাবধান।

প্রথম অপরাধ

সতাং নিন্দ নাম্নঃ পরমপরাধং– সাধু বা বৈষ্ণব নিন্দা প্রথম এবং চরম নামাপরাধ। নিন্দা বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি যে দোষে দোষী নয় তাকে সেই দোষী ঘোষণা করাই নিন্দা। এবার আগে জানা যাক সাধু বা বৈষ্ণব কে? সাধন প্রভাবে কৃষ্ণকৃপায় যাদের চিত্তের দুর্বাসনা দূরীভূত হয়ে কেবল ভক্তিবাসনাকে সম্বল করেছেন সর্বশাস্ত্র তাদেরকেই সাধুবলে ঘোষণা করেছেন। ওদিকে কুরুক্ষেত্রের মাঠে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা দিচ্ছেন, অতিদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তিভাবে কৃষ্ণকে ডাকেন তবে সেও সাধু। তাকে সাধু বলেই জানা উচিত। সাধুরেব স মন্তব্যঃ। সুতরাং যারা দুরাচারগ্রস্থ নয় এবং শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি পরায়ন তারাতো সাধুই। আর বৈষ্ণবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্যরাজ খানকে বলেছেন, যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব, পূজ্যসেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করেন, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবতর। এবং যাঁকে দর্শন করলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আসে তিনি বৈষ্ণব প্রধান। অর্থাৎ বৈষ্ণবতম। এমন সাধু বা বৈষ্ণবদের কোন প্রকারে নিন্দামন্দ করা বা তাদের বিষয়ে খারাপ মন্তব্য করা প্রথম নামাপরাধ। আর যারা এ অপরাধ করার দুঃসাহস করে তারা প্রথম শ্রেণীর অপরাধী। কেবল সাধু-বৈষ্ণব নিন্দাই নয় কোন সাধু বৈষ্ণব যদি পারমার্থিক পথ থেকে লৌকিক দৃষ্টিতে পতিতও হয় তারও নিন্দা করা যাবেনা। কেননা কৃষ্ণভক্তদের কোনও কালে দুর্গতি বা অধোগতি হয় না। পতন হয় না।

সর্বোপরি আর একটি বিষয় লক্ষনীয় তা হল, যে সমস্ত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণনাম প্রচারে,কৃষ্ণ ভক্ত বিস্তারে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ প্রসারে কৃষ্ণে সমর্পিত জীবন, তাঁদের নিন্দাগর্হিত অপরাধ। যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্– অর্থাৎ যে সকল কৃষ্ণচরনাশ্রিত ভক্ত কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা জগতে প্রচার করছেন তাঁদের নিন্দা শ্রীনামপ্রভু কিভাবে সহ্য করবেন ? শ্রীনামভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। ভগবদগীতায় নামী শ্রীকৃষ্ণ জানায়েছেন, যারা তাঁর বাণী প্রচার করে তারা তাঁর অধিক প্রিয়কারী। প্রিয়কৃত্তমঃ। শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারকদের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কেউ নাই। কখনও হবে না।। ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ অতএব 'সাধুর গুনেতে দোষ কিম্বা নিন্দা করে' তাদের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীর ভাষায় তা এইরূপ–

সেই সে বিদ্বেষী ক্রুর নরাধম গনে।
নিত্য সে ক্ষেপন করি সংসার গহনে॥

অর্থাৎ যারা প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে, কৃষ্ণনাম প্রচারকদের নিন্দা করে, সাধুলোকের অল্পছিদ্রকে বড় করে প্রচার করে, ছিদ্র না থাকলেও ছিদ্র বের করে এবং গুনের প্রশংসা করে না সেইসব ক্রুর নরাধমদের ভগবান এই সংসারেই অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন। ক্ষিপমি আসুরীষু যোনিষু। আর বৈষ্ণব নিন্দুকের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বক্তব্য এইরূপ–

চৌরাশি সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দুকে ॥

সাধুনিন্দা এমনি বিপত্তিকর। সাধু -বৈষ্ণবদের নিন্দা হলে তারা তা সহ্য করেন কিন্তু তাদের চরণধূলোগুলো মহতের নিন্দাসহ্য করেন না। সাধু বৈষ্ণবের চরণধূলো নিন্দুকের তেজোনাশ করেন। আর কেউ সাধু হয়েও যদি অপর সাধুর নিন্দাকরেন তবে তার কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তির পরম প্রয়োজন বস্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে চলে যান। "পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহন।' শ্রীচৈতন্যভাগবত জানায়েছেন শূলপানির ন্যায় শক্তিশালী পুরুষও যদি বৈষ্ণব নিন্দা করেন তারও বিনাশ হয়।

শূলপানি সমযদি বৈষ্ণবের নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্র বৃন্দে ॥

স্কন্দপুরাণ ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম'– যে মূঢ়ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে তার পিতৃপুরুষসহ নরকে পতিত হয়। পতন্তি পিতৃভিঃ। স্কন্দপুরাণ আরও জানায়েছেন, যে বৈষ্ণবকে

হনন করে, 'হন্তি', যে নিন্দা করে –'নিন্দতি' যে দ্বেষ বা হিংসা করে– 'দ্বেষ্টি' যে বৈষ্ণবকে দর্শন করে অভিনন্দন বা প্রনাম জ্ঞাপন না করে– "বৈষ্ণবান্নভিনন্দতি" যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, মারধর করে 'ক্রুদ্ধতে যাতি' এবং বৈষ্ণব দর্শনে যে ব্যক্তি 'নো হর্ষং' অর্থাৎ আনন্দিত না হয় এই ছয় প্রকার ব্যক্তিই অধঃপতিত হয়। এমনকি কেউ যদি সদ্গুরু চরণাশ্রয় গ্রহন করে নামজপাদি এবং কেবল মঙ্গলারতির দোহাই দিয়ে মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে দম্ভভরে সতীর্থ–সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা করে সেও অধঃপতিত হবে এবং তার ভগবদরাজ্যে প্রবেশের দ্বারবন্ধ হবে। অপরদিকে কেউ যদি না জানে যে ভগবান কে, ভক্তি কি বস্তু এবং কেই-বা গুরু, এমন ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব নিন্দাশূন্য হয়ে ভগবানের দিব্যনাম স্মরণ করেন তবে তিনিও অজামিলাদির ন্যায় এই ভবসংসার উদ্ধার হতে পারেন। গৃহীত হরিনাম্মামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। কেবল সাধু-বৈষ্ণব নিন্দা করাই যে অপরাধ তা নয়, যে ব্যক্তি নিন্দুকের নিকট থেকে সতীর্থ সাধু নিন্দা নির্বোধের ন্যায় শ্রবণকরে, নিন্দুকের নিন্দার প্রতিবাদ না করে, অথবা সে স্থান ত্যাগ না করে এবং নিন্দুকের কথায় সায় দেয় সেই ব্যক্তির সঞ্চিত সুকৃতির বিকৃতি ঘটে। তারও অধঃপতন হয়। মোট কথা যে নিন্দা করে এবং যে নিন্দাশ্রবণ করে তারা দু'জনেই একই দোষে দোষী। অপরাধী এই দুই দোষী ব্যক্তির শাস্তির বিধানও ভাগবত শাস্ত্রে বিঘোষিত হয়েছে। যে নিন্দাকারী তার জিহ্বাছেদন এবং যে নিন্দাশ্রবণকারী তার আত্মহনন করা উচিত। খুব কঠিন শাস্তি। কলিযুগে এই শাস্তি বলবৎ করা বড়ই কঠিন। তবে আরও দু'টি বিধান শাস্ত্রে আছে। এক, সাধু নিন্দা শ্রবণ না করে কর্ণে আঙ্গুলীপ্রদান পূর্বক নিন্দুকের স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। দুই, নিন্দুকের প্রতিবাদ করে শাস্ত্রীয় যুক্তিতে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে হবে। শাস্ত্র যুক্তিতে অপারগ হলে স্থান পরিত্যাগ করাই উত্তম। অবশ্য বৈষ্ণব চরনে অপরাধ হলে তা খণ্ডনের উপায়ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রদান করেছেন।–

যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?

চলবে...

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদ- সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ– আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক নয়। জড়াবদ্ধ জীবের দেহ ও আত্মা পৃথক পৃথক; চিৎ স্বরূপ দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী ভেদ নাই কিন্তু জড় দেহে তাহা আছে। তাই জড় দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কাজ করতে পারেনা। যেমন কান দিয়ে দেখা যায়না বা চোখ দিয়ে শোনা যায় না। এইরূপ কোন ব্যক্তির যদি কোন অঙ্গ না থাকে তবে ঐ অঙ্গের করনীয় কাজ তাহার অন্য অঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না, তাই জড় জীব এই ক্ষেত্রে 'অসম্পূর্ণ' কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে তাহা নহে। কৃষ্ণ অসম্পূর্ণ হলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই "পূর্ণ-কৃষ্ণ", সমস্ত চিদবৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে আছে। তাঁহার যে কোন অঙ্গ অন্য সকল অঙ্গের কাজ সম্পাদন করতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কোন অঙ্গহানি করেও যদি প্রকট হন তাহা কেবল তাঁর লীলাবিলাসেরই মহিমা। তিনি অসম্পূর্ণ হন না। কাজেই জগন্নাথরূপে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে প্রকট হয়েছেন, তাহা কোনভাবেই অসম্পূর্ণ নহে। অতএব জগন্নাথদেবকে শুধু শ্রীযুক্ত করলেই হবে না (১নং অনুচ্ছেদে লেখকের মারাত্মক ভুল নিশ্চয়ই এবার দূরীভূত হবে) তাঁকে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব বলে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমরা যখন শিব লিঙ্গকে পূজা করি তার অর্থ এই নয় যে, একটি লিঙ্গকে পূজা করছি। লিঙ্গ রূপী শিবকেই পূজা করছি এবং শিবের নিকট আমাদের যা কিছু প্রত্যাশা ও প্রার্থনা তাহা তাঁর লিঙ্গের নিকট করলেও একই ফল হবে। এখানে শিবজি লিঙ্গরূপে প্রকট হয়েছেন।

শ্রীতুলসীস্নান-মন্ত্রঃ

গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্য-কারিণীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং॥

চৈতন্য চন্দ্রের দয়া

-শ্রীমতি প্রাণসখী রাধিকা দেবী দাসী

আমরা সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশে। পরমপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের পরমপ্রভু। তিনি আমাদের পরম পিতা। জগৎ পতি এবং পালন কর্তা। তিনিই সব কিছুর একমাত্র ভোক্তা। আমরা তার নিত্য সনাতন অংশ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্মকরা। প্রতিটি জীবের সাথেই পরমেশ্বর ভগবানের জন্য নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক রয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য---- এই পাঁচটি মুখ্য ভাবে (রসে), পরমেশ্বর ভগবান ও জীবের মধ্যে প্রীতি বিনিময় হয়। এই পাঁচটি রসের যে কোন একটি সম্পর্কে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকাই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। আর ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের সেবা করাই জীবের স্বরূপগত অবস্থা।

কিন্তু নিজেকে ভোক্তা বলে অভিমান করে জীব যখন ভগবানের সেবা থেকে বিরত হয়, তখন তার সেই বিকৃত মায়াগ্রস্ত মতিচ্ছন্ন অবস্থা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। এই রকম স্বতন্ত্রভাবে প্রভু হওয়ার বাসনা পোষণকারী কৃষ্ণ বহির্মুখ জীবের বাসনা চরিতার্থ করতে ও তার বিকৃত অবস্থার সংশোধনের জন্য ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অবাধ্য পুত্র পিতাকে না মানলেও পিতা যেমন সর্বদাই পুত্রের হিত কামনা করে ঠিক তেমনি পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই বহির্মুখ জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী।

শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে জীব কখনোই স্বতন্ত্রভাবে সুখী হতে পারে না। তাই জড় জগৎ সৃষ্টি ও জীবের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী প্রদানের সাথে সাথে বদ্ধ জীবের উদ্ধারের উপায়ও তিনি প্রদান করেছেন। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ দিয়েছেন; বিভিন্ন অবতারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে; গুরু বা আচার্যরূপে নিজেকে প্রকাশিত করে; পরমাত্মা রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে; তদুপরি নাম, বিগ্রহ, গঙ্গা-যমুনা, প্রয়াগাদি তীর্থ, ভক্ত, তুলসী ইত্যাদি নানা উপায় বিধান করেছেন যার দ্বারা সহজেই জীবের মতি কৃষ্ণে আবিষ্ট হতে পারে।

কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া মাত্রই জীবের দুঃখ-দুর্দশার শুরু হয়। তাই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের পরবর্তী এই কলিযুগে জীবের সঙ্গে ভগবানের সেই নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে নিজেকে প্রকাশ

করেন। স্বয়ং ভগবান ভক্তভাব অঙ্গীকার করে নিজে আচরণের মাধ্যমে জীবকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেন। অন্যান্য অবতারে সংহারের মাধ্যমে ভগবান জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি ব্রহ্মারও দুর্লভ যে কৃষ্ণপ্রেম, তা সর্বসাধারণকে পর্যন্ত দান করেন।

"রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে কৈলা সংহারে।
এবে অস্ত্র না ধরিলা প্রাণে কারে না মারিলা
হৃদয়ে শোধন করিলা সবার।"

মহাপ্রভু কি করলেন? হরিনাম (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) সংকীর্তন অস্ত্র দিয়ে তিনি জীবের হৃদয় শোধন করলেন। যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করে অকাতরে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করলেন। পাপী-তাপী আচণ্ডালে হরিনাম দিয়ে তিনি উদ্ধার করলেন, যার সাক্ষী জগাই ও মাধাই।

দুবাহু তুলে হরিনাম কীর্তন করে এবং প্রেমপূর্ণ নয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি জীবের সমস্ত কলুষ নাশ করেন এবং সকলকে ভগবৎ প্রেমে আপ্লুত করেন। তার শ্রীঅঙ্গ এবং শ্রীমুখ দর্শন করা মাত্র যে কোন ব্যক্তির

পাপ ক্ষয় হয় এবং সেই প্রেম রূপ মহা সম্পদ লাভ করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন... নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে।

আপনি হচ্ছেন সবচাইতে শ্রেষ্ঠদাতা। কেননা পূর্বে অন্যান্য অবতারে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী সেই ভক্তি- সম্পদ দান করার জন্য করুণা বশত আপনি কলিযুগে অবতীর্ন হয়েছেন। আমাদের বৈষ্ণব আচার্য তাই বলেছেন, **'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার'**।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণা এমনই যে পশু-পাখিদের চিত্ত তাঁর প্রতি আবিষ্ট হয়ে যায় এবং পাষান গলে যায়। একবার হরিহর ক্ষেত্র নামক এক স্থানে মহাপ্রভু ভ্রমণ করছিলেন। সে সময় এক শুক পাখি হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের চলতি পথে এসে গৌর গৌর কীর্তন করতে লাগল। মহাপ্রভু বললেন... হে শুক, তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তন করো।' শুক বললেন,"না, আমি গৌর গৌর কীর্তন করবো।" আর কীর্তন করতে থাকলো গৌর গৌর। মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্তন না করে গৌর গৌর কীর্তন করছো, শুক পাখিটি মহাপ্রভুকে জানালেন, "কেননা আমি জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এখন রাধাভাব অঙ্গীকার করে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ রূপে নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ন হয়েছেন। আর সেই গৌরাঙ্গই এখন আমার নয়ন পথের পথিক হয়েছে।" একথা শুনে মহাপ্রভু কানে আঙ্গুল দিয়ে শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু উচ্চারণ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মাধ্যমে জীবকে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ শিক্ষা দিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণই, তাঁর ধাম সহ আরাধ্য। বৃন্দাবনের গোপীদের দ্বারা সম্পাদিত উপসনাই সবচেয়ে রমনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে অমল পুরাণ এবং সর্বোতোভাবে প্রামানিক। কৃষ্ণ- প্রেমই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই জন্য এটিই আমাদের পরম আদরের বিষয়। বৈধিভক্তি বা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি অনুসারে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে জীব কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ অধিকার লাভ করতে পারে না, পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করতে পারে। কিন্তু রাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আশ্রয়ে বৈধিভক্তি অনুশীলনের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের প্রতি ব্রজ প্রেমভক্তি লাভ হয়, যে কথা শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের এমনই দয়া।

কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের দ্বারা মহাপ্রভুর প্রেম বন্যা আজ সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গভীরতম অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবেরাও কৃষ্ণ দাস্য বরণ করে তাদের হারানো ধন ফিরে পাচ্ছে। এটাও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীল প্রবোধানন্দ পাদ তাই বলেছেন.....

অবতীর্নে গৌর চন্দ্রে বিস্তীর্নে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে॥

বিস্তীর্ন প্রেম সাগরে গৌর চন্দ্র উদিত হলেও যে সকল ব্যক্তি সেই প্রেম জলে আবগাহন না করল, তারা মহা অনর্থ সাগরেই ডুবে থাকল।

সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরনে যদি চিত্ত বৃত্তি-
শ্চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রযাতু॥

যদি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনা থাকে, যদি সংকীর্তনামৃত রসমাধুরীতে রমন করতে মন চায়, যদি প্রেম সমুদ্রে বিলাস করার অভিলাষ হয়ে থাকে, তাহলে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণাগত হও।

হে সাধুগণ, আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্বক আপনাদের পদতলে নিপতিত হয়ে শত শত কাকুতি সহকারে এইমাত্র ভিক্ষা চাইছি, আপনারা জাগতিক ধর্ম বা অধর্ম সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের চরণে অনুরাগ বৃদ্ধি করুন।

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥ (লোচন দাস)
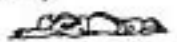
কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ জগন্নাথ

(শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির কর্তৃক ২০০৭ সনের প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' নামের এক স্মরণিকায় শ্রী শিবশংকর চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক রচিত 'কৃষ্ণ ও জগন্নাথ' নামক প্রবন্ধের কতিপয় ভ্রান্তি প্রসঙ্গে)

-শ্রী গোপাল চন্দ্র পাল (অবঃ উপ-সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী রচিত 'কৃষ্ণ ও জগন্নাথ' নামীয় প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত "অসম্পূর্ণ জগন্নাথ" প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের ৬নং অনুচ্ছেদের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জগন্নাথদেবের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মূর্তি তৈরী করতে যে কয়দিন সময় লাগবে সে সময়ে তাতে কোন বাধা দেয়া যাবেনা এবং ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে। ২ সপ্তাহ পর কোন শব্দ না পেয়ে ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল অসমাপ্ত মূর্তি পড়ে আছে।" এখানে লেখক জগন্নাথদেবের বিগ্রহ তৈরীর কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। তথাপি তার বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে বিগ্রহ অসমাপ্ত এবং তাই তিনি জগন্নাথদেবকে 'অসম্পূর্ণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এখানে প্রথমেই বলতে হয় লেখক 'মূর্তি' ও বিগ্রহের পার্থক্য ধরতে পারেননি। জড় জগতের কোন ব্যক্তির নির্মিত ধাতব বা মৃন্ময় প্রতিরূপ হলো মূর্তি এবং দেবদেবীদের ঐরূপ প্রতিরূপ হলো 'প্রতিমা' কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের এইরূপ প্রতিরূপকে 'বিগ্রহ' বলা হয়। এই বিগ্রহ জড় পদার্থ দিয়ে তৈরী হলেও তা চিন্ময় কারন ঐ বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান নিত্যই বিরাজমান। উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ ডাক বাক্স এবং সরকার অনুমোদিত ডাক বাক্সের আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। সাধারণ ডাকবাক্সে চিঠি পাঠালে তা পৌঁছাবেনা কিন্তু সরকার অনুমোদিত ডাকবাক্সে চিঠি দিলে তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে। তেমনি বিগ্রহ অনুমোদিত কিন্তু মূর্তি অনুমোদিত নয়। এজন্য মূর্তি জড়, কিন্তু বিগ্রহ চিন্ময়।

এখন 'অসম্পূর্ণ' বিগ্রহ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এটি কোন জড় জগতের কার্যকলাপ নয় যে বিগ্রহ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময় না দেয়ায় তা অসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এই রূপেই প্রকট হবেন বলে দেবর্ষি নারদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি পুণরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। একদা দ্বারকায় সকল মনিষী একটি বিরাট প্রাসাদে সমবেত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে ব্রজলীলা সম্পর্কে জানাতে রোহিনীদেবীকে অনুরোধ করেন। রোহিনীদেবী যখন শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করছিলেন তখন দ্বারে সুভদ্রাদেবী দ্বার রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রোহিনীদেবীর কৃষ্ণ লীলা বর্ণনার একপর্যায়ে বলদেব এবং কৃষ্ণ ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন এবং প্রাসাদের দ্বারে সুভদ্রাদেবীকে দেখে প্রাসাদের দিকে চুপিসারে আগমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণলীলা শ্রবণে সুভদ্রাদেবী এত তন্ময় ছিলেন যে, বলরাম এবং কৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করেননি। বলরাম এবং কৃষ্ণ সুভদ্রাদেবীর দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করছিলেন এবং ভাবাবেশে তাঁদের হস্তপদ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত হতে থাকে। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর এইরূপ প্রকাশ দেখে পরম আনন্দিত হন এবং জগতে তাহা প্রকট করার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন, জগতে এইরূপ বিগ্রহ প্রকট করবেন। তারই ফলশ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রাদেবীর এইরূপ প্রকট হয়েছে। তাহা কোন প্রকারেই 'অসম্পূর্ণ' নহে। লীলা বিলাসের কারনেই ভগবান এইরূপ প্রকটিত হয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দ্বার খোলাতে বিগ্রহ সম্পূর্ণ হয়নি, তাহা জড় ভাবনার প্রকাশ। তাহা জড় দৃষ্টি সম্ভূত।

আর এই বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই কিন্তু তিনি এখানে জগন্নাথ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন– কৃষ্ণরূপে নহে। যেমন ভগবান কৃষ্ণ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ আদি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকট হয়েছেন। কাজেই রথযাত্রা অনুষ্ঠানটি কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর হলেও এখানে তাহা জগন্নাথ,বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রূপ বলেই গণ্য হবে। এই বাক্যটিতে ২নং অনুচ্ছেদে লেখকের যে 'বিপর্যয়' দেখা দিয়েছে তাহা আশাকরি দূরিভূত হবে। এই ব্যাখ্যাটি সঠিক অনুধারন করতে পারলে ১০ নং অনুচ্ছেদে বলরাম ও সুভদ্রার আগমনের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূরিভূত হবে। এই অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন "সর্বশেষ বৈষ্ণবদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জগন্নাথদেবের পরিবর্তে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা স্থান নিয়েছে বলে যে অনুমান ভিত্তিক তথ্য দিয়েছেন তাহাও নিশ্চয় অনুধাবন হবে।

এখন "অসম্পূর্ণ জগন্নাথ" বলে যে লেখক নিজের শাস্ত্রজ্ঞানের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তা বর্ণনা না করলে আমার ব্যাখ্যাটিও অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ব্রহ্ম সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৩২নং শ্লোকে বর্ণিত আছে।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশে অত্যুজ্জল গৌড় মণ্ডল পরিক্রমা- ২০০৮

শ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'পৃথিবীতে যত আছে। নগরাদিগ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম একই রকম ভাবে বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষাভাষী ও বর্ণের মানুষও একদিন গৌর পার্ষদ বর্গের অবির্ভাব স্থলে সমবেত হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞে মেতে উঠবে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ পৃথিবীর প্রায় ৪০টির অধিক দেশের ভক্তবৃন্দ বাংলাদেশে এসে গৌড় মণ্ডল পরিক্রমা করে গেলেন। এ বছর গৌর পূর্ণিমার শেষে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নেতৃত্বে বাংলাদেশে এই পরিক্রমার সূচনা হয়। বাংলাদেশে চৈতন্য মহাপ্রভু ও গৌর পার্ষদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক লীলাস্থল রয়েছে। সেখানে রয়েছে ইস্‌কনের অনেক মন্দির, সে সবস্থানে বিদেশী ভক্তবৃন্দ পরম আগ্রহ এবং ভক্তিভরে এসব মন্দির দর্শন করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে, 'গৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামনি, তার হয় ব্রজভূমে বাস' গত ২৬শে মার্চ এই পরিক্রমা দলটি শ্রীল জয়পতাকা আচার্য্য পাদের নেতৃত্বে বেনাপোল পাট বাড়ীতে এসে পৌছায়। পর্যায়ক্রমে রাজশাহীতে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থল প্রেমতলী এসে পৌছায়। এভাবে তারাগঞ্জ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, হবিগঞ্জ, সিলেট, মুরারী গুপ্তের বাড়ী, শ্রীবাস ঠাকুরের জন্মস্থলী, সেবিত নারায়ণ বিগ্রহ, শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস ঢাকা দক্ষিণ, কুলাউড়া রঙ্গিরকুল মন্দির, কুমিল্লার শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির, চৌমুহনী ইস্‌কন মন্দির, ফেনী নামহট্ট, কক্সবাজার শ্রীশ্রী রাধাদামোদর মন্দির, কক্সবাজার পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, পুণ্ডরীকধাম, শ্রীবাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের ভজন কুটির, প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণমন্দির, ফরিদপুর মন্দির, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, খুলনা ইস্‌কন মন্দির, মংলা বন্দর, কাটাখালী গৌর নিতাই মন্দির ও সুন্দরবন দর্শন করে শ্রীশ্রী রূপসনাতন স্মৃতি তীর্থ হয়ে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

উল্লেখ যে দীর্ঘ ২১দিন পরিক্রমায় বিভিন্ন মন্দিরে প্যাণ্ডেল প্রোগ্রাম, বৈদিক নাটক, নৃত্য ও যাদু প্রদর্শন করে। তবে বিদেশী ভক্তবৃন্দের উপস্থাপিত আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানটি ছিল 'শ্যামনৃত্য' যা সমস্ত ভক্তবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাছাড়া অগ্নিনৃত্যও বিশেষ ভাবে ভক্তদের আনন্দ দান করেছে। এই পরিক্রমায় তিনটি স্থানে দীক্ষাদান করা হয়। পুণ্ডরীকধাম, রূপসনাতন স্মৃতি তীর্থ ও তারাগঞ্জে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ দীক্ষা প্রদান করেন। বিদেশী ভক্তদের সাফারী দলটির ম্যানেজার শ্রীমরীচী দাস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশের আতিথেয়তা দেখে তারা খুবই মুগ্ধ হয়েছেন। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীর অভ্যর্থনা দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ঠাকুরগাঁয়ে রাধাগোপীনাথ মন্দিরে লক্ষাধিকভক্তের সমাগমে তাঁরা উচ্ছসিত হয়ে উঠে। তাছাড়া ঢাকার স্বামীবাগ মন্দিরে এক বিশাল সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মেয়র, বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা, প্রফেসর ডঃ দূর্গাদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ডঃ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ও আরো অনেকে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, শ্রী যশোদা নন্দন আচার্য্য, সভাপতিত্ব করেন ইস্‌কনের অন্যতম আচার্য্য ও দীক্ষা গুরু শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ।(সংবাদদাতাঃ প্রাণেশ্বর চৈ.দাস)

সিঙ্গাপুরে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) কর্তৃক পরিচালিত **'নামহট্টসংঘ'** সারা বিশ্বে যে নামের হাট পাতিয়াছে, **সিঙ্গাপুরেও** তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতি শনিবারে দুর-দুরান্ত থেকে ৫০জনের অধিক ভক্ত এই নামহট্টে নাম সুধা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ছুটে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ম অনুসারে তুলসী আরতি, গৌর আরতি, নৃসিংহ স্তব, শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ এবং নাম সমাপনী কীর্তন শেষে উপস্থিত সকল ভক্ত বৃন্দকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। আমরা চার বছর যাবৎ এই অনুষ্ঠানটি করে আসছি। তাই সকল ভক্তবৃন্দের নিকট প্রার্থনা নিত্যকাল ব্যাপী যেন এই নামহট্টকে ধরে রাখতে পারি এবং এর প্রসার ঘটাতে পারি। সকলে এই আশির্বাদ করবেন।

বিনীত নিবেদকঃ

সিঙ্গাপুর নামহট্টসংঘের সকল ভক্তবৃন্দ

বৈদিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

পুরাণের আলোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

– শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

দ্বাপরযুগের শেষভাগে আসুরিক স্বভাবসম্পন্ন শাসকগোষ্ঠীর কুশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতায় একসময় এ সুন্দর ধরণী পাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ওইসময় অন্যায়-অবিচার, নারীনির্যাতন ও সন্ত্রাস-সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র পৃথিবীই শান্তিকামী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। এ দুর্বিসহ অবস্থায় মাতা বসুন্ধরা খুবই বিচলিতবোধ করতে লাগলেন এবং তিনি নিরুপায় হয়ে ব্যথিতচিত্তে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে তাঁর দুঃখের কথা বলার জন্য রওনা হলেন। একটি গাভীর রূপ ধারণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতা বসুন্ধরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন। তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মাও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং শিঘ্রই এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করতে মাতা বসুন্ধরা ও দেবতাদের নিয়ে তিনি শিবালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অতঃপর দেবাদিদেব মহাদেবের নেতৃত্বে সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার অনুগামী হয়ে শ্রীবিষ্ণুর কৃপালাভে ক্ষীর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মাতা বসুন্ধরাও অত্যন্ত বিনম্রভাবে তাঁদের অনুসরণ করলেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীরে পৌঁছে তাঁরা সমবেতভাবে বিশ্বের রক্ষাকর্তা শ্রীবিষ্ণুর বন্দনা শুরু করলেন – যিনি বরাহ রূপ ধারণ করে পূর্বে বসুন্ধরাকে রক্ষা করেছিলেন।

বৈদিক শাস্ত্রে **'পুরুষ-সূক্ত'** নামক একটি বিশিষ্ট স্তোত্র রয়েছে, যার দ্বারা দেবতারা প্রয়োজনে শ্রীবিষ্ণুর বন্দনা করেন। কোন রকম জটিল সমস্যা হলেই স্বর্গের দেবতারা তার প্রতিবিধানকল্পে প্রথমে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন এবং ব্রহ্মা তখন তাঁদেরকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য কামনায় বৈদিকমন্ত্রে অত্যন্ত বিনীতভাবে করজোড়ে তাঁর স্তব শুরু করেন। এটাই স্তব তথা প্রার্থনার যথাযথ বৈদিক রীতি। সুদূর মহাকাশে শ্বেতদ্বীপ নামক গ্রহাকৃতি অতীব সৌন্দর্যমন্ডিত এক বিরাট ভুবন রয়েছে; আর সেখানে ক্ষীরসমুদ্র নামক এক বিশাল সমুদ্র রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই পৃথিবীতে যেমন লবনসমুদ্র রয়েছে, তেমনি অন্যান্য গ্রহেও নানারকম সমুদ্র রয়েছে; যেমন – দুধের সমুদ্র, কোথাও বা তেলের সমুদ্র, কোথাও বা সুরার সমুদ্র ইত্যাদি। **'পুরুষ-সূক্ত'** হচ্ছে সেই স্তব – যার দ্বারা দেবতারা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর তথা ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শান্তভাবে শয়ন বিষ্ণুর বন্দনা করে থাকেন। তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি তথা নারায়ণ, যার থেকে এই ব্রহ্মান্ডের অবতারগণ প্রয়োজনে প্রকট কিংবা প্রকাশিত হন। দেবতারা তাঁর শক্তি, অপার মহিমা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত বলেই ব্রহ্মা ও শিবের নেতৃত্বে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্তব করা শুরু করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তাঁদের সম্মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মার কাছে বার্তা প্রেরণ করলেন। তিনি ব্রহ্মাকে জানালেন যে, অচিরেই তাঁর পরাশক্তিসহ অসুরকুল বিনাশনে তিনি মর্ত্যে অবতরণ করবেন এবং তখন দেবতারাও যেন তাঁদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য তথায় গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন – যে কুলে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ধর্মসংস্থাপনে নেতৃত্ব দেবেন। ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে পাওয়া এ মঙ্গলবার্তা তখন দেবতাদের শোনালেন। তিনি তাদের আনন্দের সাথে জানালেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরনীর পাপভার লাঘবের জন্য দম্ভ, অহঙ্কার ও আসুরিক শক্তির প্রতিভূ মথুরাপতি কংসের ভগ্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন। দেবগণ ও মাতা বসুন্ধরাকে মধুরবাক্যে আশ্বস্ত করে ব্রহ্মাজী তারপর নিজ ধাম, ব্রহ্মান্ডের সর্বোচ্চলোক – ব্রহ্মালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

গীতা ৪/৭-৮ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৃষ্টিতে আবির্ভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

অর্থাৎ, হে ভরত বংশীয় অর্জুন! যখন যখন ধর্মের গ্লানি তথা চরম অধঃপতন সূচিত হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান তথা প্রসার ঘটে, তখনই আমি সাধুসজ্জনদের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হই। বাস্তব জগতেও দেখা যায়, সব কাজ প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় না। জটিল সমস্যা নিরসনে শীর্ষ তথা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়। এমনি এক জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতেই দ্বাপর যুগের শেষভাগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের পাপভার লাঘবের জন্য স্বয়ং সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অব্যক্ত (পরমাত্মা রূপী) ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হওয়াই অবতার। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে,

তাঁর অবতার বা প্রকাশ অনন্ত। তিনি প্রয়োজনে যে কোন রূপ তথা মূর্তিতেই তাঁর সৃষ্ট জগতে কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ কিংবা প্রকাশিত হতে পারেন। পরম বিষ্ণুভক্ত কবি জয়দেব দশ অবতারস্তোত্রে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছেন, **"তুমি মৎস্য অবতারে বেদের উদ্ধারসাধন করেছ, কূর্ম অবতারে পৃথিবীকে পিঠে বহন করেছ, বরাহ অবতারে ধরণীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছ, নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছ, বামন অবতারে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থণাচ্ছলে দৈত্যরাজ বলিকে প্রবঞ্চিত করেছ, পরশুরাম অবতারে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করেছ, রাম অবতারে হল ধারণ করেছ, বুদ্ধ অবতারে জগতে সবার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছ। অবশেষে কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছকুলকে বিমোহিত করবে। হে দশাবতারধারী! হে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে নমস্কার জানাচ্ছি – কায়মনবাক্যে আমি তোমার উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম নিবেদন করছি।"**

****

পাদটীকাঃ অ্যারাবিয়ান তথা সেমেটিক জাতির ধর্মগ্রন্থে বহু পয়গম্বরের নাম উল্লেখ থাকলেও শেষ পয়গম্বর বলে একটি কথা আছে। কিন্তু বৈদিক দর্শন বলছে, শেষ অবতার বলে কোন কিছু নেই। সৃষ্টি-ধ্বংস (প্রলয়) একটি চলমান প্রক্রিয়া। সৃষ্টির পর ধ্বংস; আবার ধ্বংসের পর সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর সৃষ্টিতে যুগোপযোগী ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগেই অবতীর্ণ হন। গীতা ও পুরাণশাস্ত্রে একথাই বলা হয়েছে। বৈদিক দর্শনের অন্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে, **'যার অস্তিত্ব আছে, তার আকার আছে।'** এ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যদি একটি আকার থেকে থাকে, তবে তার স্রষ্টারও নিশ্চয়ই আকার আছে। অস্তিত্বশীল (সাকার) বিশ্ব নিরাকার তথা শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়নি। শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্য; আবার শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ করলেও তার ফল শূন্য হয়। তাই বৈদিকশাস্ত্রে শূন্যবাদ মান্য নয়। এ শাস্ত্রে সৃষ্টির অতীত অপ্রপঞ্চকে 'অব্যক্ত' বলে প্রচার করা হয়েছে। **'অব্যক্ত'**এর ব্যক্ত অবস্থাই সৃষ্টি। চর্মচক্ষুতে যা দেখা যায় না, **'তা নিরাকার'** – এমন ভাবনা ঠিক মনে করা যায় না। দূর থেকে হিমালয় পর্বতও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই বলে তার কোন আকার নেই , তা সত্য বলে গণ্য করা যায় না। হরেকৃষ্ণ!

(২৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুপাদের আদেশ মতো কৃষ্ণভাবনামৃত সেবায় আত্মস্থ হলাম।

শ্রীগুরুর আদেশে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার এবং পরপর তিনবছর ক্যালিফোর্নিয়ায় সুবিশাল রথযাত্রা উৎসব করি। আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথের জয়যাত্রা। ১৯৭০ সালে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে পূণ্যভূমি ভারত দর্শন এবং কলকাতায় কীর্তনানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ স্বামী, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ, শ্রীমৎ ভানু মহারাজ, শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ স্বামী, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ, শ্রীমৎ ভানু মহারাজ, শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী সকলের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭০-১৯৭২ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রচার কার্যক্রমের সঙ্গে সেবা দায়িত্বে যুক্ত থাকি। ১৯৭২ সালে অস্ট্রেলিয়াতে ইস্কনের কার্যকলাপ পরিচালনা জন্য আমাকে ইস্কন গভর্নিং বডি কমিশনাররূপে নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে আমি শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী সেবাযজ্ঞে শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজের সঙ্গে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সংযুক্ত।

আমার পরম আগ্রহ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে যেভাবে জয়ী হয়েছে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন, তা আমাদের সংঘবদ্ধ প্রচার প্রচেষ্টায় গোটা বিশ্বকে প্লাবিত করুক। বেদভিত্তিক যে বৈদিক সমাজ সুপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষে আদর্শ কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ জীবনের সন্ধান দিয়েছিল, আজকের একবিংশ শতাব্দীর পথে গোটা বিশ্বে তারই পুনরুজ্জীবন ঘটুক। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উচ্চগ্রামে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এ কথা স্থির বিশ্বাস সহ উপলব্ধি করতে পারেঃ

কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।
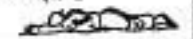
ইস্‌কন মাদারীপুর ভক্তগ্রুপ প্রতিষ্ঠা

সমগ্র মাদারীপুর জেলার কৃষ্ণভক্তদের সংগঠিত করে গত ২৯মে ২০০৮ইং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) মাদারীপুর ভক্তগ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্‌কনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য শতাধিক কৃষ্ণভক্ত অর্ন্তভুক্তিক্রমে ভক্তগ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ২০০৮ উপলক্ষ্যে মাদারীপুর জেলা সদর ও পার্শ্ববর্তী পাঠক কান্দির প্রণবমঠ, সেবাশ্রম, পুলপদ্দি, শ্রীশ্রী হরিমন্দির, হরিজন পল্লির শ্রীশ্রী হরি মন্দির, চর মুগরিয়া শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, পোদ্দার বাড়ী হরিমন্দির, শিবচর রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির এবং ভদ্রাসন শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে ভাগবতীয় অনুষ্ঠান করা হয় ও কৃষ্ণগ্রন্থ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা সহ প্রায় ৩০০শত গৃহে কৃষ্ণ গ্রন্থ ও পত্রিকা বিনা ভিক্ষায় বিতরণ করা হয়।
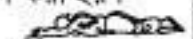
আমি কিভাবে কৃষ্ণ ভক্ত হলাম

– শ্রীপাদ মধুদ্বিষ দাস

সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বিজয়ের গর্ব গোটা আমেরিকার। এই যুদ্ধে আমেরিকার হার্ভার ছাড়া আর কোন অঞ্চল বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। এর পরিবর্তে যুদ্ধের বেশীর ভাগ মারণাস্ত্র উৎপাদন ও যোগান দিয়ে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা এসময় বাড় বাড়ন্ত; আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলা, কারখানা সর্বত্রই আমেরিকার প্রাধান্য। একমাত্র আমেরিকাই গোটা ইউরোপে সবরকম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিয়ে প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের যখন এইরকম প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থা সেই সময় ১৯৪৭ সালে আমার জন্ম হয় আমেরিকার ম্যাসিটিচিউট্‌স রাজ্যে।

আমার বাবা আমেরিকার নৌবহরের ক্যাপ্টেন-এর্ডএল্লার্ড মরিসি। মা– মার্গারেট মরিসি পরম ধর্মপরায়ণা। পাঁচ বোন দু'ভাই আমরা। আমার ডাক নাম ছিল মাইকেল। বাবা রণতরীর সৈনিক হলেও বরাবরই তাঁর ধর্মজীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। মা অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণা ক্যাথলিক খ্রিস্টান; ছেলেবেলায় প্রতিদিন মায়ের হাত ধরে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার মধ্যে আমার ধর্মজীবনের অনুশীলন শুরু হয়। আমার বয়স যখন সবে মাত্র পাঁচ, তখন ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের কাছে আমার শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত। ছ'বছর পূর্ণ হতেই সেন্ট গ্রেব্রিয়াল স্কুলে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার শিক্ষাজীবনের শুরু হল। প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষ হতেই ভর্তি হই মাস্টাল ল্যাটিন স্কুলে। এরপর ম্যাসিটিচিউট্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে পড়া শুরু করি। ইতিমধ্যে আমেরিকা ভিয়েতনামকে আক্রমণ করে বসেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভিয়েতনামের ওপর এই আগ্রাসী আক্রমণকে তীব্র ধিক্কার জানায়। বহু শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ আমেরিকান যুবকরা এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঘর ছেড়ে পড়ে। এরাই– হিপি নামে খ্যাত।

১৯৬৭ সালে আমি ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ হতেই আমিও প্রতিবাদী মন নিয়ে হিপি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। এইভাবে হিপি সেজে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সানফ্রান্সিসকোর ইস্‌কন হরেকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণভক্তদের ভাল লেগে যায়। খোঁজ নেই দর্শনজ্ঞানের মূল শিক্ষাদর্শনের। ভক্তদের অনুরোধমতো কৃষ্ণ কীর্তনে যোগ দিয়ে আমিও মহানন্দ লাভ করি।

একদিন যোগ দিলাম নানারকম কৃষ্ণভাবনামৃত অনুষ্ঠানে। প্রসাদ সেবা করে আবার ভবঘুরে মন নিয়ে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই মনে হল কৃষ্ণভক্তদের সৌম্যদর্শন, বিনম্র আচরণ, এতে কত সুখ, না জানি এই কৃষ্ণভক্তদের শ্রীগুরুদেব শ্রী প্রভুপাদের কত অশেষ গুণাবলী। আগ্রহ হল তাঁকে দর্শনের।

পরের বছর ১৯৬৮ সালে সানফ্রান্সিসকোর হরেকৃষ্ণ মন্দিরে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জগৎগুরু মহান আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন মাত্র আমি অভিভূত হই। ঠিক করি আর হিপি সেজে থাকা নয়। তখনই প্রকৃত মনুষ্য জীবনের কামনায়, শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ কৃপায়, ভগবৎ জীবন শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। যোগ দেই ইস্‌কনে। ছিলাম হিপি সেজে হিপি আন্দোলনে, যোগ দিলাম কৃষ্ণের দাস সেজে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে। ১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে দীক্ষা দেন। সেই থেকে আমি আর মাইকেল মরিসি নই; আমার পরিচয় মধুদ্বিষ দাস।

এই সময় ভিয়েতনামে যুদ্ধে যাওয়ার ডাক আসে। বাধ্যতামূলকভাবে আমাকে রণাঙ্গনে যেতে হয়। আমি মাথায় শিখা, গলায় তুলসীমালা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, হাতে জপমালা– এ সব নিয়েই চলে আসি রণাঙ্গনে।

আমাকে দেখে লেফটেনান্ট জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি এভাবে যুদ্ধ করবে? আমি বলি, না, আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে'। আমি রণক্ষেত্রের সৈন্যদের মধ্যে সত্যিকারের জীবনের মন্ত্র হরিনাম সংকীর্তন-প্রচার করতে চাই।' লেফটেনান্ট ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'একে তা আমেরিকার সৈন্যরা এই অন্যায় যুদ্ধ করতে নারাজ, তার ওপর একে যদি নেওয়া হয় তবে তো সর্বনাশ।

সেই মুহূর্তে শ্রীল প্রভুপাদের একটি চিঠি লেফটেনান্টের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। তাতে লেখা ছিল 'ওকে যেন যুদ্ধে না পাঠানো হয়। ও কৃষ্ণভক্ত ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।'- লেফটেনান্ট আমাকে দেখে, আমার আচার আচরণে এমনিতেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর প্রভুপাদের চিঠি পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। যেন ভাবলেন 'একে যদি যুদ্ধে পাঠানো হয়, তবে অন্যান্য সৈন্যদের মধ্যেও সে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করবে? এই সব সাত পাঁচ ভেবে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি পুনরায় শ্রীল

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রভুপাদের পত্রাবলী

অনুবাদক: শ্রী প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাসাধিকারী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সান ফ্রানসিসকো
২৮ মার্চ ১৯৬৭ ইং

প্রিয়, ব্রহ্মানন্দ, সৎস্বরূপ, রায়রামা, গর্গমুণি, রূপানুগ ও ডোনাল্ড।

তোমরা আমার আশির্বাদ গ্রহন করো। গত ২৪ মার্চের পত্র এবং তৎপূর্বের উইলিয়াম আলফ্রেড হোয়াইট ইংক এর নামে প্রেরিত পত্রটি পেয়েছি। আমি ইতপূর্বে মিঃ গোল্ডস্মিথ এর পত্রের উত্তর দিয়েছি, তাতে ব্যবসা সংক্রান্ত অসদাচরণের যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেছি। গোল্ডস্মিথ এর ধারনা উক্ত টাকা পুনরায় ফেরত পাওয়ার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। এমতাবস্থায় পুনরায় এ ব্যাপারে আর কোন টাকা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে ৬০০০ হাজার ডলার প্রদান করা হয়েছিল সুতরাং নতুনকরে এ ব্যাপারে আর বিনিয়োগ করার নিস্প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সব কিছু ভুলে যাওয়া কর্তব্য। আর আমাদের মনেকরা উচিত যে কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং তোমার বোকামির জন্য ঘটেছে। তবে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সর্তক হতে হবে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছাই যা হবে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে। একমাত্র কৃষ্ণই আমাদের যা প্রয়োজন তাই প্রদান করবেন। সদা আনন্দে থাক এবং সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাক। ইতিপূর্বে আমি তোমাকে বহুবার বলেছি যে আমার গুরু মহারাজ আমাকে বলতেন যে এই জড় জগৎ ভদ্রলোকের বসবাসের জন্য যথোপযুক্ত নয়। গুরু মহারাজের বক্তব্যের যথার্থতা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তা দেওয়া হল।

যস্য অস্থি ভাগবতী অবিঞ্চনা ভক্তি
সর্বে গুনাইস তত্র সমাসতে সুরা
হরা অভক্তস্য কুতো মহগুনা
মনোরথেন অস্তো ধরাতো বহি'

অর্থাৎ যিনি প্রকৃত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহন করেননি তিনি কখনই উৎকৃষ্ট গুনময় হতে পারেন না। তথাকথিত কেউ হয়তো ভদ্রলোক হতে পারেন তবে তিনি হয়তো জড় প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেন যা মূলত মনোধর্মী চেতনা এবং তিনি বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা যে কোন সময় কলুষিত হতে পারেন। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির আশ্রয়ে আছেন তিনি অবশ্যই সমস্ত দেবতাদের প্রতিও ভক্তিযুক্ত হবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে সুন্দর জামা কাপড় পরিহিত ভদ্রলোকের প্রতি তোমার বিশ্বাস স্থাপন করা সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে এরকম অনেক তথাকথিত ভদ্রলোকের দেখা মিলবে তারা সাপের মতো এসব ভয়ানক লোকের থেকে সর্বদা সাবধান হতে হবে।

আমি সানফ্রানসিসকো প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে গীতোপনিষদ ছাপানোর জন্য একটা দরপত্র নিয়েছি। তবে তারা পাঁচ হাজার কেস বাইন্ডিং সোনালী হরফের মূল্য ধার্যকরেছে ১১০০০ হাজার ডলার। এ কাজের জন্য আমি এখান থেকে ৫ হাজার ডলার যোগাড় করেছি, আর তোমরা যতটা পার সাহায্যে করলে আমি খুশি হব, তাহলে আমি কাজে হাত দিতে পারি। আশাকরি তোমরা বাকী অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত বিক্রয় করে অথবা বাইরের সাহায্য নিয়ে তা সংগ্রহ করবে।

তোমাদের একান্ত
ভক্তি বেদান্ত স্বামী

চলবে...

দৃষ্টিআকর্ষণ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) কর্তৃক প্রকাশিত **ত্রৈমাসিক 'অমৃতের সন্ধানে' ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়** প্রকাশিত প্রশ্ন উত্তর পর্বে ৭নম্বর প্রশ্ন যার পৃষ্ঠা নং- ৩৯ (উনচল্লিশ)। **'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' পৃষ্ঠা নং ১০০৩ (একহাজার তিন) অনুযায়ী "ম্লেচ্ছ " কথাটি অহিন্দুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।** কিন্তু লেখক শুধুমাত্র মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ বলে একটু বাড়িয়ে বলেছে। শাস্ত্র অনুযায়ী চতুরাশ্রম বর্জিত সকলকেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ বলে অবহিত করা হয়। সে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিষ্টান যাই হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। সদাচার বিহীন হিন্দুকেও ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। শুধু মাত্র মুসলমানকে উক্ত নামে অবহিত করা অনুচিৎ। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ভুল ব্যাখ্যা প্রচার হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ভবিষ্যতে এ রকম ভুল ব্যাখ্যা যাতে প্রকাশিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখব বলে আশাকরি। হরেকৃষ্ণ!

বিনীত নিবেদক–
সম্পাদক

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সপ্তম অধ্যায়

শ্লোক-১

শৌনক উবাচ

নির্গতে নারদে সূত ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১॥

শব্দার্থ

শৌনক– শ্রীশৌনক; **উবাচ**– বললেন; **নির্গতে**– চলে গেলে; **নারদে**– নারদ মুনি; **সূত**– হে সূত; **ভগবান**– দিব্য শক্তিসম্পন্ন; **বাদরায়ণঃ**– ব্যাসদেব; **শ্রুতবান**– শুনেছিলেন; **তৎ**– তাঁর; **অভিপ্রেতম্**– মনোবাঞ্ছা; **ততঃ**–তারপর; **কিম্**– কি; **অকরোৎ**– করেছিলেন; **বিভুঃ**– মহৎ।

অনুবাদ

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন- হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন কি রকম অলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে এবং সে জন্য অর্জুন তাকে দণ্ডদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করার পূর্বে শ্রীল ব্যাসদেব ধ্যানে তা জানতে পেরেছিলেন।

শ্লোক-২

সূত উবাচ

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥ ২॥

শব্দার্থ

সূতঃ– শ্রীসূত; **উবাচ**–বলেছিলেন; **ব্রহ্মনদ্যাম্**–বেদ, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত নদী; **সরস্বত্যাম্**– সরস্বতী; **আশ্রমঃ**– আশ্রম; **পশ্চিমে**–পশ্চিম দিকে; **তটে**–তটে; **শম্যাপ্রাসঃ**– শম্যাপ্রাস নামক স্থানে; **ইতি**– এইভাবে; **প্রোক্তঃ**– উক্ত; **ঋষীণাম্**– ঋষিদের; **সত্রবর্ধনঃ**– কার্যে আনন্দ বর্ধনকারী

অনুবাদ

শ্রীসূত বললেনঃ বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরস্বতী নদীর পশ্চিম তট সেজন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। সেখানে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে শ্রীল ব্যাসদেবের আশ্রম। শ্রীল ব্যাসদেব ছিলেন গৃহস্থ তবুও তাঁর গৃহকে আশ্রম বলা হয়েছে। আশ্রম হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পারমার্থিক প্রগতি সাধনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থানটি গৃহস্থ না সন্ন্যাসীর সেটি বিচার্য নয়। বর্ণাশ্রম প্রথা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে জীবনের প্রতিটি স্তরকেই এখানে আশ্রম বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সেই সমাজ-ব্যবস্থায় সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী, সকলের জীবনেরই উদ্দেশ্য একটি– পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। সুতরাং সেই সমাজ-ব্যবস্থায় কেউ কারো থেকে নগণ্য নয়। বিভিন্ন আশ্রমের পার্থক্যগুলি ত্যাগের মাত্রা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পার্থক্য মাত্র। সেই সমাজব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের সব চাইতে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করা হয় তাদের ত্যাগের জন্য।

শ্লোক ৩

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোহপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥৩॥

শব্দার্থ

তস্মিন্‌— সেই (আশ্রম); **স্বে**— নিজস্ব; **আশ্রমে**— আশ্রমে; **ব্যাসঃ**— ব্যাসদেব; **বদরীষণ্ড**— বদরী বৃক্ষ; **মণ্ডিতে**— মণ্ডিত; **আসীনঃ**— উপবেশন করে; **অপঃ উপস্পৃশ্য**— জল স্পর্শ করে; **প্রণিদধ্যৌ**— একাগ্র করেছিলেন; **মনঃ**— মন; **স্বয়ম্‌**—স্বয়ং।

অনুবাদ

সেই স্থানে শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

তাঁর গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে ব্যাসদেব পারমার্থিক কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত সেই স্থানে তাঁর মনকে একাগ্র করলেন।

শ্লোক ৪

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎপুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়ম্‌ ॥ ৪ ॥

শব্দার্থ

ভক্তি— ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; **যোগেন**— যুক্ত হওয়ার পন্থার দ্বারা; **মনসি**— মনে; **সম্যক্‌**— পূর্ণরূপে; **প্রণিহিতে**— যুক্ত; **অমলে**— জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অপশ্যৎ**— দর্শন করেছিলেন; **পুরুষম্‌**— পরমেশ্বর ভগবানকে; **পূর্ণম্‌**— পূর্ণ; **মায়াম্‌**— শক্তি; **চ**—ও; **তৎ**— তাঁর; **অপাশ্রয়ম্‌**— সম্পূর্ণরূপে বশীভূত।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল পরম-তত্ত্বকে পূর্ণরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়। সে কথা ভগবদগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম-সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায় এবং এই পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সাক্ষীরূপে জীব-হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। শ্রীনারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের ধ্যানে মগ্ন হতে। শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্যোতিতে মনোনিবেশ করেননি, কেন না তা পরম দর্শন নয়। পরম দর্শন হচ্ছে ভগবৎ-দর্শন, যা ভগবদগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছেঃ 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' (৭/১৯)। উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে বাসুদেব, পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মজ্যোতির (হিরন্ময়েন পাত্রেণ) আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং ভগবানের কৃপায় যখন সেই আবরণ উন্মোচিত হয় তখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত রূপ দর্শন করা যায়। পরম-তত্ত্বকে এখানে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং ভগবদগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই পুরুষই হচ্ছেন অনাদি এবং আদি পুরুষ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম। ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, তার মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিই প্রধান। এখানে ভগবানের যে শক্তির কথা বলা হয়েছে তা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি, যা তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। চন্দ্রের সঙ্গে যেমন জ্যোৎস্না বিরাজ করে, তেমনই পরম পুরুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বিরাজ করেন। বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করা হয়েছে, কেন না তা জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখে। 'অপাশ্রয়ম্‌' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে ভগবানের এই শক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরা শক্তিকেও মায়া বলা হয়, কিন্তু তা হচ্ছে যোগমায়া, অথবা যে শক্তি চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। কেউ যখন এই অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকেন, তখন জড়া প্রকৃতির অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়। এমন কি যাঁরা আত্মারাম, তাঁরাও এই যোগমায়া অথবা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তিযোগ হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া; তাই সেখানে বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া শক্তির কোন স্থান নেই, ঠিক যেমন চিন্ময় জ্ঞানের আলোকের সামনে অন্ধকারের কোন স্থান নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যের মাধ্যমে যে দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়, এই অন্তরঙ্গা শক্তি তার থেকে অনেক শ্রেয়। ভগবদগীতায় বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। পরম পুরুষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৫

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্‌।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥৫॥

শব্দার্থ

যয়া– যার দ্বারা; **সম্মোহিতঃ**– সম্মোহিত; **জীবঃ**– জীব; **আত্মানম্**– আত্মা; **ত্রিগুণাত্মকম্**– প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বদ্ধ, অথবা জড় পদার্থ; **পরঃ**– পরা; **অপি**– সত্ত্বেও; **মনুতে**– বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া; **অনর্থম্**– অনর্থ; **তৎ**– তার দ্বারা; কৃতম্ চ– প্রতিক্রিয়া; **অভিপদ্যতে**– ভোগ করা হয়।

অনুবাদ

এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত জীবের দুঃখ ভোগের মূল কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরম পুরুষার্থ লাভের জন্য কিভাবে সেই দুঃখের নিবৃত্তি করা যায় তার পন্থাও বর্ণিত হয়েছে। তা সবই এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জীব তার স্বরূপে জড় জগতের বন্ধনের অতীত, কিন্তু এখন সে বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তাই সে নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করছে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে। জীব ভ্রান্তিবশত নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে। অর্থাৎ, জড় প্রকৃতির প্রভাবে তার বর্তমান বিকৃত চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তার স্বাভাবিক চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা রয়েছে। তার স্বরূপে জীব চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতিরহিত নয়। ভগবদগীতাতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদ্ধ অবস্থায় জীবের প্রকৃত জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। যে মতবাদ প্রচার করে যে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম তা এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা কখনই সম্ভব নয়। কেন না তার স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় জীবের চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। জীবের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার কারণ বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব, যার অর্থ হচ্ছে মায়াশক্তি তাকে পরিচালিত করছে এবং পরমেশ্বর ভগবান পৃথকভাবে দূরে রয়েছেন। ভগবান চান না যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হয়ে থাকুক। বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া সে কথা জানেন, কিন্তু তবুও তিনি বিস্মৃত আত্মাদের তাঁর বিভ্রান্তিকর প্রভাবের দ্বারা সম্মোহিত করে রাখার অপ্রশংসনীয় কর্তব্য গ্রহণ করেন। ভগবান মায়া শক্তির প্রভাবকে হস্তক্ষেপ করেন না, কেন না বদ্ধ জীবের চেতনার সংশোধনের জন্য মায়ার এই প্রভাবের প্রয়োজন রয়েছে। স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন চান না যে অন্য কেউ তাঁর সন্তানকে তিরস্কার করুক, তবুও তিনি তার অবাধ্য সন্তানদের বশে আনার জন্য কঠোর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখেন। পরম স্নেহময় পরম পিতাও তেমনই চান যে সমস্ত বদ্ধ জীব যে মায়ার দুঃখময় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। রাজা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেন। পরম স্নেহময় পরম পিতাও তেমনই চান যে সমস্ত বদ্ধ জীব যেন মায়ার দুঃখময় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। রাজা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু কখনও কখনও কয়েদিদের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য রাজা ব্যক্তিগতভাবে কারাগারে গিয়ে তাদের বিকৃত মনোবৃত্তির পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ দেন এবং তাঁর অনুরোধ অনুসারে আচরণ করার ফলে কয়েদিরা তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ধাম থেকে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং ভগবদগীতা আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে উপদেশ দেন যে যদিও এই মায়াশক্তির প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে অনায়াসে এই দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এই শরণাগতির পন্থাই হচ্ছে মায়ার সম্মোহিনী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা। এই শরণাগতি লাভ করা যায় সাধু সঙ্গের প্রভাবে। ভগবান তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী সাধুদের বাণীর প্রভাবে মানুষ অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হতে পারে। তখন বদ্ধ জীব ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং আসক্তির স্তরে উন্নীত হয়। এই পন্থায় পূর্ণতা লাভ করা যায় শরণাগতির মাধ্যমে। এখানে ব্যাসদেবরূপে তাঁর অবতরণে ভগবান সেই নির্দেশই দিয়েছেন। অর্থাৎ, বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে দণ্ডদান করে এবং স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে অন্তরে এবং বাহিরে পথ প্রদর্শন করে ভগবান বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে তিনি গুরু হন, এবং বাহিরে সাধু শাস্ত্র এবং দীক্ষাগুরুরূপে তিনি গুরু হন। তা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদের কেন উপনিষদে দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে মায়াশক্তির অধ্যক্ষতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এখানেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জীব ব্যক্তিগতভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীব ভিন্নভাবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই

শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই বহিরঙ্গা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব। মায়াও পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানে সমীপবর্তী হতে পারেন না। মায়া কেবল জীবের উপর ক্রিয়া করতে পারেন। তাই যে সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে যে পরমেশ্বর ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব হন, তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব এবং ভগবান যদি সমপর্যায়ভুক্ত হন, তা হলে ব্যাসদেব অবশ্যই তা দর্শন করতে পারতেন, এবং বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক দুঃখ ভোগ করার কোন প্রশ্নই উঠত না, কেন না পরম পুরুষ জ্ঞানময়। অবিবেকী অদ্বৈতবাদীরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা মাধ্যমে ভগবান এবং জীবকে সমপর্যায়ভুক্ত করতে চায়। ভগবান এবং জীব যদি সমপর্যায়ভুক্ত হতেন, তা হলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না অদ্বৈতবাদীদের মতানুসারে তা তো মায়াশক্তির প্রভাবে জড় কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা মঙ্গলময় পন্থা। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীবের যথার্থ রোগ নির্ণয় করেছেন, যা হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার সম্মোহন। তিনি দেখেছিলেন যে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানের চেয়ে মায়াশক্তি বহু দূরে অবস্থিত, এবং তিনি বদ্ধ জীবের রোগগ্রস্থ অবস্থা এবং তাদের রোগের কারণ দর্শন করেছিলেন। সেই রোগ নিরাময়ের উপায় পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব নিঃসন্দেহে গুণগতভাবে এক, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর, আর জীব হচ্ছে সেই মায়াশক্তির অধীন। এইভাবে জীব এবং ভগবান এক এবং ভিন্ন। এখানে আর একটি বিষয়েও স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছেঃ ভগবানের সঙ্গে জীব নিত্য চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত, তা না হলে ভগবান বদ্ধ জীবদের মায়ার কবল থেকে মুক্ত করার কষ্ট স্বীকার করতেন না। তেমনই, জীবেরও কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রদ্ধা পুনর্জাগারিত করা এবং সেটিই হচ্ছে জীবের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধ জীবদের সেই চরম লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত করে।

শ্লোক ৬

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ

অনর্থ– যা অর্থহীন; **উপশমম্**– উপশম; **সাক্ষাৎ**– প্রত্যক্ষভাবে; **ভক্তি-যোগম্**– ভক্তিযোগ; **অধোক্ষজে**– ইন্দ্রিয়াতীত; **লোকস্য**– জনসাধারণের; **অজানতঃ**– যারা অজ্ঞান; **বিদ্বান্**– বিদ্বান; **চক্রে**– সংকলন করেছেন; **সাত্বত**– পরম সত্য সম্বন্ধীয়; **সংহিতাম্**– বৈদিক শাস্ত্র।

অনুবাদ

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম-তত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন অংশও দর্শন করেছিলেন। তিনি ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং অংশের অংশ কলা অর্থাৎ ভগবানের বিভিন্ন অবতারদেরও দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি বিশেষভাবে মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশাও দর্শন করেছিলেন। এবং সবশেষে তিনি জীবের বদ্ধ অবস্থা নিরাময়ের উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা দর্শন করেছিলেন। এটি হচ্ছে এক মহান পারমার্থিক বিজ্ঞান, যার শুরু হয় ভগবানের নাম, যশ, মহিমা ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে। সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্বিকাশ শ্রবণ এবং কীর্তনের যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর না তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর। ভগবান যখন ভক্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে প্রীত হন, তখন তিনি তাকে তাঁর প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। তবে শ্রবণ, কীর্তনাদি নির্দেশিত পন্থায় জড় জগতের অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশার তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। এই জড় আসক্তির নিবৃত্তি চিন্ময় জ্ঞানের বিকাশের অপেক্ষা করে না। পক্ষান্তরে, জ্ঞান পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির ভক্তিযুক্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

মিথ্যাচারী

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কেউ যদি বাইরে সংযমী ব্যক্তির মতো আচরণ করে অথচ ভেতরে ভোগের বিষয়সমূহ চিন্তা করে, তা হলে সে একজন মিথ্যাচারী অর্থাৎ ভণ্ড।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আমরা কোনও ভণ্ড শিষ্য গ্রহণ করে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই না, বরং আমরা শুধু একজন আন্তরিক এবং নিষ্কপট ব্যক্তিকে চাইছি।"

সকলের প্রতি তাঁর খোলাখুলি নির্দেশ হল এই যে, কেউ যদি ব্রহ্মচারী থাকতে পারেন, তা হলে তা অত্যন্ত চমৎকার–তবে কৃত্রিম ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত–সেটা আমাদের সমস্যা নয়। যদি দেখা যায় ব্রহ্মচারী থেকে কোনও ব্যক্তি যতটুকু কৃষ্ণসেবা করতে পারছেন, বিবাহিত হলে তিনি আরও উৎকৃষ্টতরভাবে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে কৃষ্ণসেবা করতে সক্ষম হবেন, তা হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রম বরণ করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের নীতি।

শ্রীল প্রভুপাদের বহু গৃহস্থ শিষ্যই অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার যজ্ঞকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। তাঁরা এক-এক জন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর মতোই আন্তরিক। সুতরাং আশ্রমিক পার্থক্য একটি বাহ্য ব্যাপার মাত্র। উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কপটভাবে এবং আন্তরিকভাবে হরিভজন করা।

গৃহস্থ আশ্রমে উৎসাহ

সাধারণত 'দু' ধরনের মানুষ গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করে থাকেন– (১) পরমহংস এবং (২) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের মতো ব্যক্তিরাও গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করেছিলেন। ইস্কনের এখনও বহু গুরু এবং জি বি সি রয়েছেন, যাঁরা গৃহস্থ। অনেক সময় পরহংস স্তরের বৈষ্ণবরাও আদর্শ গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করেন। তাঁদের ক্ষেত্রে গৃহস্থ হওয়া না হওয়া সমান।

দ্বিতীয় প্রকারের গৃহস্থরা হলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে

কেউ এই সমস্ত নিম্নস্তরের ব্রহ্মচারীদের জোর করে ব্রহ্মচারী বানিয়ে রাখতে চান এবং তাদের গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে বাধা দেন। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ

"সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন, পরিবারবর্গের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি বিবাহ অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করা উচিত? ভগবান এখানে (গীতা ১৮/৫) বলেছেন যে, মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। বিবাহ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে সংযত করে শান্ত করা যাতে সে পরমার্থ সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই 'বিবাহ যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করা উচিত এবং তাদের এই ভাবে অনুপ্রাণিত করা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কর্তব্য।"

ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য- গীতা-১৮/৫

যাঁরা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছেন, তাঁরা উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের অনুকরণ করতে অক্ষম। তাকে যদি জোর করে উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীদের মতো জীবন যাপন করতে বলা হয়, তা হলে সে হয়তো অবৈধভাবে তার কামনাবাসনাকে চরিতার্থ করবে। সুতরাং যাঁরা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছেন, তাঁদের গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীদেরও কর্তব্য তাঁদের গৃহস্থ আশ্রমে অনুপ্রাণিত করা।
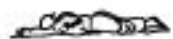
ছবিতে ছোটদের দশ অবতার

কুর্ম অবতার

সময়টা ষষ্ঠ মন্বন্তরের বর্তমান কল্পে যখন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এবং তাঁর প্রজারা খুবই দুর্বিপাকে পতিত হয়েছিল। তাঁরা নিজেরা সেই সব সমস্যার সমাধান করতে পারছিলনা। অবশেষে তাঁরা স্থির করলো যে স্রষ্টা ব্রহ্মা যিনি মরু পর্বতে বাস করেন তার শরণাপন্ন হবেন।

ব্রহ্মা তখন কিছু সময়ের জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। তৎপর:
তাহলে চল আমরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হই। তিনি তাদেরই সাহায্য করেন যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাছাড়া তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক এবং রক্ষাকারী।

সুতরাং তারা বিষ্ণুর কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। যিনি সমস্ত কিছুর রক্ষাকারী।
হে, সর্ব শক্তিমান- সর্বেসর্বা- আপনি অবশ্যই অবগত আছেন কেন এই পৃথিবীর পালকগণ আপনার শরণ নিয়েছে। আমরা আপনার চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- আপনি আমাদের এই মহাবিপদ থেকে মুক্ত করুন।

ভগবান বিষ্ণু তখন দীপ্ত কণ্ঠে বললেন- তোমাদের কঠোর তপস্যার দ্বারা অমরত্ব লাভই মুক্তির পথ।

ও! প্রভু তাহলে কিভাবে আমরা এই অমরত্ব লাভ করতে সমর্থ হব?
তোমাদের সমস্ত রকমের লতা-ঘাস গুল্ম, লুপ ইত্যাদি সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অতপর: মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করবে আর সর্পরাজ বাসুকীকে সেই পর্বতের দড়ি হিসাবে ব্যবহার করবে।
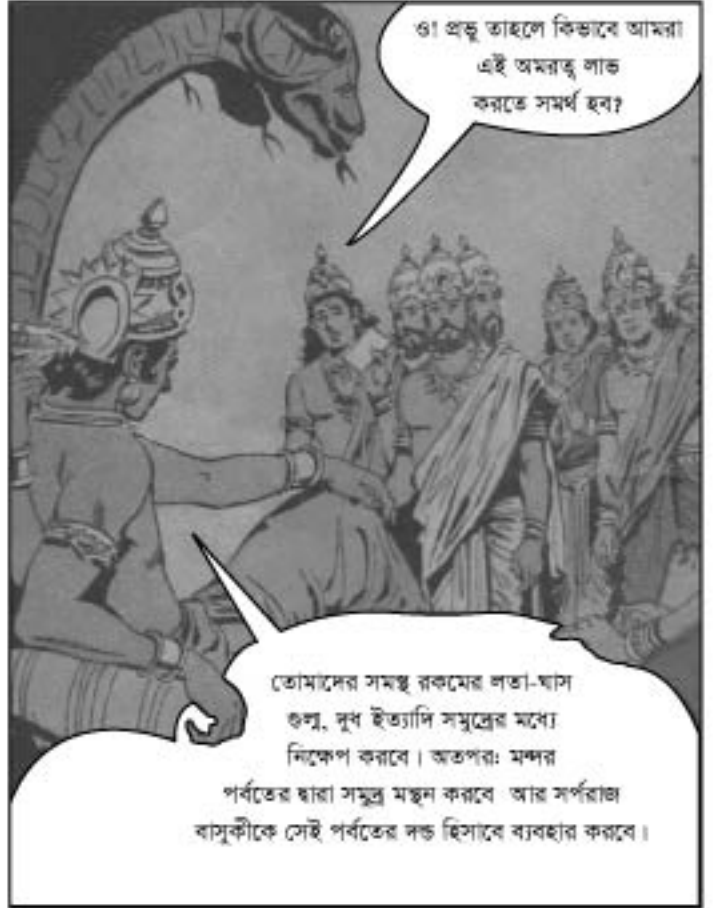
সেই সময় মহারাজ বলি ও অসুরেরা দেখল যে তাঁদের শত্রুরা আসছে- হে রাজন- আমরা ওদের পাকরাও করি- ওরা এখন নিরস্ত্র এবং অসহায়। না- অপেক্ষা কর কারন দেবতারা নিশ্চয়ই কোন প্রস্তাব নিয়ে আসছে- যা আমাদের জন্য মঙ্গল জনক হতে পারে।

বলি মহারাজ ইন্দ্র ও দেবতাদের সন্মানের সাথে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে আসন প্রদান করলেন।

বলি মহারাজ ও তাঁর সেনা প্রধান সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানালো এবং অসুর ও দেবতাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হলো।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই বলি মহারাজ এবং ইন্দ্রের সৈন্য সামন্ত হাজির হলে তারা মন্দর পর্বত উত্তোলনের কাজ শুরু করবে।

● অনুবাদক: প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাস

● চলবে......

উপদেশে উপাখ্যান

"পরের কথায়, কিবা আসে যায়"

পিতা, পুত্র দুইজন হাঁট থেকে একটি ঘোড়া কিনে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। পুত্র বলল, "বাবা! আপনি ঘোড়ার পিঠে উঠুন।" বৃদ্ধলোকটি তাই করল। কিছুদূর যাওয়ার পর কতকগুলি লোক বলতে লাগল-দেখ! দেখ! বুড়োটার জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছুই নাই। নিজে ঘোড়ার পিঠে চেপে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত লোকের কথা শুনে বৃদ্ধ পিতা নেমে গিয়ে পুত্রকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কতগুলি লোক বলতে শুরু করল,- "দেখ! দেখ! অতবড় ছেলেটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বৃদ্ধ বাবাকে দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানাচ্ছে আর-ও-ঘোড়ার পিঠে চেপে আরাম করে যাচ্ছে?" এই কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পুত্র ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল।

এবার পিতাপুত্র স্থির করলেন, তাদের দুইজনেই ঘোড়ার পিঠে করে যাওয়াটাই ভাল। এই কথাটি স্থির করে দুইজনেই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। তখন আবার কিছুলোক বলতে লাগল-"তোমাদের বিবেকবুদ্ধি বলতেকিছুই নাই? একটি রোগা ঘোড়ার পিঠে তোরা দুইজন জওয়ান উঠেছ। ও বেচারার কষ্ট হচ্ছে না? তোমরা একেবারে বিবেকের মাথা খেয়ে বসেছ?" এই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে দুইজনেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চলতে লাগলেন। আবার কিছু লোক বলতে শুরু করল- "এদের মতো বোকা জগতে আর কেউ আছে? টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনে নিজেরা কষ্ট করে হেঁটে যায়?" তখন দুইজনেই চিন্তা করতে লাগলেন, এবার কি করা যায়?" সামনে একটি সেতু পার হতে হবে। স্থির করলেন,- ঘোড়ার চার পায়ে বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এবং তাই করা হল। পথের লোকজন এই কাণ্ড দেখে হৈ হৈ করে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। তখন ঘোড়াটি ছটফট করতে করতে দড়ি ছিঁড়ে নদীতে পড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে দুইজনই পড়ে গিয়ে ঘোড়া ও পিতাপুত্র তিনজনেই ইহলোক ত্যাগ করলেন।

হিতোপদেশ

কেউ যদি হরিভজনের পথ অবলম্বন করেন, তাহলে জগতের কামাসক্ত কৃষ্ণবহির্মুখ মানুষ তাঁকে কত সমালোচনা করবে। তাঁকে জগতের লোক কত নিন্দা করবে। কিন্তু তাদের কথায় কান না দিয়ে হরিগুরু বৈষ্ণবের নির্দেশানুসারে চললে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হবেই হবে। সাধু-শাস্ত্রগুরুবাক্য লঙ্ঘন করে জগতের লোকের কথা শুনলে উক্ত গল্পের ন্যায় সর্বনাশ হবে।

আমার দুঃখের সীমা নাই

এক নিরক্ষর বৃদ্ধ কৃষক দৈহিক দুর্বলতায় ভুগিতেছিলেন। চিকিৎসক তাহার জন্য প্রতিদিন কিছু দুগ্ধ পান করিবার উপদেশ দিলেন এবং ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। কৃষক একদিন দুধ পান করিয়াই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন-"আমার শরীর কতটা সবল হইয়াছে।" এ প্রকার দুই তিন দিনও যখন সবলতার প্রমাণ পাইলেন না, তখন তিনি কাহাকেও না জানাইয়া অপরিমিত দুগ্ধ পান করিলেন। তাহার আর পরীক্ষা করিতে হইল না। সবলতা-লাভের আশায় ধৈর্যহীন হইয়া অপরিমিত দুগ্ধ পান করার ফলে উদরাময় রোগগ্রস্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যাধির দ্বারাও আক্রান্ত হইলেন। ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িল। তিনি তখন বলতে লাগলেন- "বদমাশ ডাক্তার। কেনো কাণ্ডজ্ঞান নাই। অর্থ উপার্জনের লালসায় তার এই কাজ। আমায় কি বাজে ঔষধ দিল, যার ফলে আমার আর দুঃখের সীমা নেই। ওঃ, আমার কি কষ্ট! আমার কি দুঃখ!

হিতোপদেশ

অনাদি কাল হইতে মায়াবদ্ধ জীব সকল শ্রীভগবানকে ভুলিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছে। কেউ কোনো পুণ্য প্রভাবে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করে ভগবদ্ভজনে ব্রতী হয়। অনেকে দুইচারদিন হরিনাম করিয়া বিরক্ত হইয়া "লম্ফ ঝম্প" প্রদান করে। তৎপরে অধৈর্য্য হইয়া হরিভজন ছাড়িয়া দিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়।

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু বিঘ্নময় সমস্যাময় স্বল্পকালের জীবনে অধৈর্য্য হইবেন না। অতি ধীরে ধীরে শ্রীভগবানের কৃপা প্রতীক্ষায় গন্তব্য পথে পদক্ষেপ করিবেন। তাঁহার অনিত্যকালের এই জীবনটিকে অনন্তকাল ধৈর্য্যধারনের জন্য প্রস্তুত রাখেন। তাঁহারা জানেন চঞ্চল হইলেই ভগবদ্‌কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। তাই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম দৃঢ়রূপে হৃদয়ে স্থাপন পর্বক সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারই আনুগত্যে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান এই প্রকার ধৈর্য্যবান ব্যক্তিকেই কৃপা করেন। অন্যকে নয়।

গৌর মণ্ডল

ীক্ষা- ২০০৮

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

১। প্রশ্ন : রাঁধুনী যদি বৈষ্ণবীয় বিধি আচরণকারী না হয়, তাহলে কি তার রন্ধনকৃত নিরামিশ খাদ্যদ্রব্যে কি সাত্ত্বিক গুণ বজায় থাকে? কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্য সব অবস্থাতেই সাত্ত্বিক গুণ বজায় থাকে?

উত্তর ঃ ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির গুন অনুসারে তিন প্রকার মানুষের জন্য তিন প্রকার খাদ্য নির্ণয় করেছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ । রাঁধুনী যদি সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণবীয় গুণে গুণান্বিত না হয় তাহলে তার রন্ধনকৃত খাদ্য দ্রব্যে সাত্ত্বিক গুণ বজায় থাকতে পারেনা। কারন রাঁধুনীর স্বভাব অনুসারে তার রন্ধনকৃত খাদ্য দ্রব্যের গুন প্রকাশ পায়। পুরাকালে মুনিঋষিরা সাত্ত্বিক খাদ্য নির্বাচন করে গেছেন। সেগুলি হচ্ছে– যে সমস্ত আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ বৃদ্ধি করে এবং সরল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম। যেমন দুগ্ধজাত খাদ্য– শর্করা, অন্ন, গম, ফলমূল, শাকসব্জী এই সমস্ত খাদ্যে সর্ব অবস্থাতেই সাত্ত্বিক গুণ বজায় থাকে। খাদ্যের উদ্দেশ্যে হচ্ছে আয়ু-বর্ধন করা, মনকে পবিত্র করা এবং শরীরকে শক্তিদান করা। সেটাই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য। আর শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে, সেই খাদ্য যা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে–

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি সত্ত্ব শুদ্ধৌ।
ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলব্ধে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

ভগবানকে নিবেদন করার ফলে আহার্য দ্রব্য সমূহ শুদ্ধ হয়। এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্ত্বা শুদ্ধ হয়। সত্ত্বা শুদ্ধ হওয়ার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয়। তখন সে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজে পায়।

২। প্রশ্ন ঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের "সংকেত" এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কি? এবং হরিনামের সঙ্গে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে বলা হয় মহামন্ত্র। আর এই মহামন্ত্র এবং হরিনামের কোন পার্থক্য নাই। হরে শব্দের অর্থ ভগবানের শক্তি। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ সর্বাকর্ষক, রাম শব্দের অর্থ আনন্দদায়ক। যখন মানুষ এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ বা কীর্তন করেন, তখন ভগবান তাঁর শক্তির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকে আকর্ষণ করেন। অপ্রাকৃত আনন্দ দান করেন।

আর মহা মানে যার উর্দ্ধে আর কোন কিছু হয় না। মন মানে মন, ত্র মানে ত্রান। যাহা মনকে ত্রান করেন তাই মহামন্ত্র। তাই এই কলিহত জীবের ত্রানের একমাত্র উপায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর সর্বদা কীর্তন করা জপ করা। কলি সন্তরন উপনিষদে বলা হয়েছে–

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই ষোল নাম বত্রিশটি অক্ষর কলিযুগের পাপ নাশের জন্যই উদ্দিষ্ট। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন বা জপ ছাড়া কলিহত মানুষের আর কোন মুক্তির উপায় নাই।

প্রশ্নোত্তরে : শ্রী পুস্পশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী

৩। প্রশ্নঃ কি কারনে প্রহ্লাদকে দৈত্যহিরন্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মাতে হল জানতে চাই?

উত্তরঃ প্রহ্লাদ পূর্বজন্মে সোমশর্মা নামে মহাতেজা তাপসী ছিলেন। তপস্যা করতে করতে একদা তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে সোমশর্মার কাছে কতকগুলি দৈত্য আসে। তাঁদের কথোপকথনের তর্জন গর্জনে সোমশর্মার ধ্যান ভেঙ্গে যায় এবং দৈত্যদের দর্শন করে সোমশর্মা অত্যন্ত ভীত হন। ধ্যানরত সেই সোমশর্মা দৈত্যভয়ে ভীত হলে সেইকালেই তাঁর প্রানবায়ু বহির্গত হয়। অর্থাৎ দৈত্যভয়ে ভীত হয়েই সোমশর্মা দেহত্যাগ করেন। ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন– যং যং বাপি স্মরনভাবং ত্যাজত্যন্তে কলেবরম্ (গীতা-৮/৬) অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যে ভাব নিয়ে দেহত্যাগ করে সেই ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। পদ্মপুরানেও সেকথা বলা হয়েছে- মরনে যাদৃশো ভাবঃ প্রানিনাং পরিজায়তে॥ তাদৃশাঃ স্যুস্ত্ত সত্বান্তে তদ্রুপাস্তৎপরায়না। প.পু.ভূমি ১২৩/৪৬-৪৭॥

দৈত্যভয়ে ভীত হওয়ার কালে মৃত্যুবরণ করায় সোমশর্মা পরজন্মে দৈত্য গৃহে হিরন্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ রূপে জন্ম গ্রহন করে। দৈত্যভয়েন সংযুক্তঃ স হি মৃত্যুবশং গতঃ॥ তস্মাদ্দেত্যগৃহে জাতো হিরন্যকশিপোঃ সুতঃ। প.পু.ভূমি ৫/১৬-১৭॥

৪। প্রশ্নঃ যেমন ব্রাহ্মনের নয়টি গুন, ক্ষত্রিয়ের ছয়টি গুনের কথা বলা হয়েছে তেমনি স্ত্রীলোক বা নারীর কোন গুনের কথা শাস্ত্রে আছে কি?

উত্তরঃ উত্তমা নারীর গুনের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরানে বলা হয়েছে–

রূপমেব গুনঃ স্ত্রীনাং প্রথমং ভূষনং শুভে।
শীলমেব দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ং সত্যমেব চ॥
আর্জবত্বং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং ধর্মমেব হি।
মধুরত্বং তত প্রোক্তং ষষ্ঠমেবং বরাননে॥
শুদ্ধত্বং সপ্তমং বালে হ্যন্তর্বা হ্যেযু যোষিতাম্।
অষ্টমং হি পিতুর্ভাবঃ শুশ্রূষা নবমং কিল॥
সহিষ্ণুর্দশমং প্রোক্তং রতিশ্চৈকাদশং তথা।
পাতিব্রত্যেং ততঃ প্রোক্তং দ্বাদশং বরবর্ণিনি॥

-প.পু.ভূমি. ৩৪/২৯-৩২

অর্থাৎ রূপ নারীর প্রথম গুণ। রূপই শ্রেষ্ঠ ভূষণ। দ্বিতীয় গুণ শীল, তৃতীয় সত্য-সত্যবাদিতা, সত্যবাদিনী, চতুর্থগুণ আর্জব-সরলতা, কপট শূন্যতা, সরলা, পঞ্চম ধর্ম, ধর্মপরায়ণতা, ধর্মপরায়না, ষষ্ঠগুণ, মাধুর্যতা, মাধুর্যময়ী, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধত্ব, শুদ্ধতা, নির্মলতা, নির্মলা, এটি সপ্তম গুণ। অষ্টম পিতৃভাব, মাতৃ হয়েও পিতৃভাব এ নারীর জন্য অভিনব বার্তা, শুশ্রুষা হচ্ছে নারীর নবম গুন। সহিষ্ণুতা দশম, রতি নারীর একাদশ গুন, এই রতি হলে হৃদয়ে প্রেমভক্তি জাগে। অর্থাৎ রতি গাঢ় হলে প্রেম উপজয়। আর নারীদের দ্বাদশ গুণ হচ্ছে পতিব্রত।

৫। প্রশ্নঃ অনেকে ধর্মীয় গ্রন্থ বা গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র কাপড়ে বেঁধে রেখে পূজা করে এর কি কোন শাস্ত্রীয় প্রমান আছে? আর কেনই বা পূজা করতে হয়?

উত্তরঃ গীতা, ভাগবত শাস্ত্র কাপড়ে বেঁধে পূজা করতে হবে এমনটি নয়। কাপড়ে না বেঁধেও পূজা করা যাবে। তবে একটি বিষয়- তা হলো কেবল কাপড়ে বেঁধে পূজা করাই যথেষ্ট নয়। সেই শাস্ত্র গুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নও করা কর্তব্য। এবং তাতে যে ভগবৎ আদেশ আছে সেগুলি পালন করা কর্তব্য। এটা ঠিক যে গীতা-ভাগবত শাস্ত্র ভক্তিভরে পূজা করলে স্বয়ং ভগবানেরই পূজাকরা হয়। তস্মিন প্রপূজিতে বিপ্রপূজিতঃ কমলাপতিঃ কেননা গীতা-ভাগবত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতার। বা শব্দ ব্রহ্ম।

গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র মন্দিরে বা গৃহ মন্দিরে রেখে পূজার বিধান পদ্মপুরানে আছে। প্রমান শ্লোক-ভূমি খন্ড ৬৭/৩৯॥

৬। প্রশ্নঃ পাপ অথবা পুণ্যকারী কর্মকর্তাকে কিভাবে কর্মফল অনুসরন করে। অর্থাৎ পাপীর শাস্তি পুণ্যকারীর স্বর্গ ভোগ কিভাবে ঘটে থাকে?

উত্তরঃ কর্মকর্তাকে কিভাবে কর্মফল অনুসরন করে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

সহস্র সহস্র ধেনু মধ্য থেকে বৎস যেমন আপন মাতাকে চিনতে পারে তেমনি পাপ-পুণ্য কর্ম কর্তাকে চিনতে পারে। বৎস্য যেমন মাকে অনুসরণ করে পাপ-পুণ্য তেমন কর্মকর্তাকে অনুসরণ করে প্রমান স্বরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন–

যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি॥

প.পু.ভূমি. ৮১/৫২; ৯৪/১৯

আরও বলা হচ্ছে কুমার যেমন মৃৎপিণ্ডকে আপন ইচ্ছায় ভাণ্ড প্রস্তুত করে তেমনিভাবে পূর্বকৃত পাপ পুণ্য কর্মকর্তার অনুগমণ করে–

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
তথা পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি॥

প.পু.ভূমি. ৮১/৪৭; ৯৪/১৩

যে যেমন কর্ম করে অনুরূপ ফল সে পায়। যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম তাদৃশং পরিভুজ্যতে॥ পু.পু.ভূমি ৯৪/৭,৯। কৃষক ব্যক্তি যে রকম ফসলের বীজ বপন করবেন কালান্তরে সে তো তদনুরূপ শস্যই প্রাপ্ত হবেন। এটাই নিয়ম এটাই বিধান। কৃষিকারো যদা দেবি ছন্নং বীজং সুসংস্থিতম্। যাদৃশন্ত বপত্যেব তাদৃশ্যং ফলমশ্নুতে॥ পু.পু.ভূমি ৯৪/৭,১০। অন্যত্রও এই কথা–ক্ষেত্রেষুযাদৃশং বীজং বপতে কৃষিকারকঃ তাদৃশং ভুঞ্জতে তাত ফলমেব ন সংশয়ঃ ঐ ৯৪/৮৯ কর্মফল কর্মকারীকে অনুসরনের প্রক্রিয়া অভিন্ন দৃষ্টান্ত ও বলা হচ্ছে– যেমন বীজ বপন করা হবে, তেমনই ফল ফলবে। কটু থেকে মধু উৎপত্তি হয় না। আবার মধু থেকেও কটু ফলের উৎপত্তি হয় না। অর্থাৎ লোকে দুষ্ট বীজ বপন করে কখনই ভাল ফল আশা করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে যাদৃশং বপতে বীজং তাদৃশং ফলমশ্নুনতে। আর যে ব্যক্তি বীজ বপনই করবে না সে কোনই ফলভোগ করতে পারে না। ন বাপয়তি যঃ ক্ষেত্রং ন স ভুমজতি তৎফলম॥ প.পু.ভূমি. ৯৭/৬০

মূলতঃ পাপ-পুন্যে কর্মফল শয়ন ব্যক্তির সাথে শয়ন করে, গমন করলে গমন করে, স্থির থাকলে স্থির থাকে। কর্মফল জীবের ছায়ার ন্যায় কর্তাকে অনুগমন করে। কর্ম এবং কর্তা পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।

শেতে সহ শয়ানেন পুরা কর্ম যথা কৃর্তম।
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি॥
করোতি কুর্বতঃ কর্মচ্ছায়েবানুবিধীয়তে।
যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুমম্বদ্ধৌ পরস্পর ॥
প.পু.ভূমি. ৮১/৫৫; ৯৪/২১,২২

৭। প্রশ্নঃ 'শ্রীপাদ' এটি অনেকের নামের আগে যুক্ত করা হয় কেন? "শ্রীপাদ' এর অর্থ কি?

উত্তরঃ 'শ্রীপাদ'— 'শ্রী'কে পালন করেন যিনি, তিনি 'শ্রীপ' 'শ্রী' অর্থে সর্বলক্ষীময়ী শ্রীমতি রাধারানী। রাধারানীকে পালন করেন শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-'শ্রীপ'। আর 'শ্রীপ' কে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে যিনি সমর্থ তিনি 'শ্রীপাদ'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীকে যিনি প্রদান করতে পারেন তিনিই 'শ্রীপাদ' বিশেষনে বিশেষিত হতে পারেন। শ্রিয়ং পাতীতি শ্রীপঃ কৃষ্ণস্তমাদদাতীতি তথৈবানেন কৃতং অগ্রগ্রে ভবন্ত ভগবন্তঃ। চৈ.চ.না. ৫/২১॥

৮। প্রশ্নঃ অপরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি ব্যাখ্যা জানতে চাই?

উত্তরঃ অপরা প্রকৃতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুৎকৃষ্টা শক্তি। ভৌতিক শক্তি। ভগবদগীতায় ভগবান এবং অ-পরা বা জড়া প্রকৃতি বিষয়ে বলেছেন— 'ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ এবং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা. ৭/৪॥ অর্থাৎ 'ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহংকার এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত'। এই আটটি জড়া প্রকৃতির মধ্যে ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয়— সেগুলি হচ্ছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আস্বাদন এবং গন্ধ। এই দশটি তত্ত্ব প্রাকৃত বিজ্ঞানেও বর্তমান। কিন্তু অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই তিনটি তত্ত্বও বিদ্যমান। জড়া বা অপরা প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের অনুৎকৃষ্টা শক্তি থেকে জাত।

আর পরা প্রকৃতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্টা শক্তি। সে প্রসঙ্গেও ভগবান গীতায় বলেছেন—'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ গীতা. ৭/৫॥ 'এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারন করে আছে।' এই শ্লোকের তাৎপর্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন— জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তিতে অবস্থিত। ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তিই হচ্ছে জড় জগৎ, যা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার নামক উপাদানগুলি রূপে প্রকাশিত হয়েছে। জড় জগতে স্থূল পদার্থ— ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এবং সূক্ষ্মপদার্থ— মন, বুদ্ধি ও অহংকার এ সবগুলিই ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তির থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই অনুকৃষ্টা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার অভিষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করছে যে জীব সে হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি এবং এই শক্তির প্রভাবেই সমস্ত জড় জগৎ সক্রিয় হয়ে আছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা সক্রিয় না হলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন কর্মই সাধিত হয় না। শক্তি সবসময়ই শক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীব সর্বদাই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

সংক্ষেপে এই হল অপরা এবং পরা প্রকৃতির বিশ্লেষন।

৯। প্রশ্নঃ দীক্ষা গ্রহন না করে কি মালা জপ করা যায়, এবং তুলসীমালা গলায় ধারন করা যায়?

উত্তরঃ জপ মালায় কৃষ্ণনাম জপ করতে দীক্ষা গ্রহনের প্রয়োজন নেই। দীক্ষা গ্রহন না করেও যে কেউ কৃষ্ণনাম জপ করতে পারেন। কৃষ্ণনাম জপে পাপী-তাপি, জাতি-অজাতি বিচার নাই। ঠিক একই ভাবে দীক্ষা গ্রহন না করেও তুলশী মালা গলায় ধারন করা যায়। ১৮খানা পুরানের প্রায় ১২ খানা পুরানে তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে এবং সকল মানব মাত্রই তুলসী মালা কণ্ঠে ধারনের বিধি বিবৃত হয়েছে।

১০। প্রশ্নঃ যে সকল লোক বেদের ক্রিয়া কর্ম করে না তারা কি কৃষ্ণ ভক্ত?

উত্তরঃ যারা বেদের ক্রিয়া কর্ম করে না তারা তো নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত। তবে আর একটা অপ্রিয় সত্য কথা যে, বেদের ক্রিয়া কর্ম করলেও কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যাবেনা। কেবল কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য কর্ম করলে তবেই কৃষ্ণভক্ত হওয়া যাবে। কৃষ্ণভাবনাবিহীন বেদের যে কর্ম কাণ্ড তা শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে। প্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছেন— যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ গীতা ২/৪২॥ অর্থাৎ অবিবেকী মানুষেরাই কেবল বেদের কর্মকাণ্ডে মোহিত হয়। তারা স্বর্গসুখ ভোগাসক্ত হয়ে থাকাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিদের ধারনা— ভাবনা যথার্থ নয়, তাই যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রয়াসে পুনরায় শ্রীমুখের উক্তি— শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ গীতা. ২/৫৩॥ অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডীয় বিচিত্র প্রলোভনে বিচলিত হলে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যাবে না।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আর কিছুই চাই না

ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কোন কোন গ্রহের নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপাদন হয়। এই পৃথিবীর দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের জ্ঞানের অভাবে, যারা একটুখানি সোনা তৈরী করতে পারে তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের বশীভূত হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই জড় জগতের উচ্চতর লোকে জম্বুনদীর তটের মৃত্তিকা জম্বু ফলের রসে মিশ্রিত হয়ে সূর্যকিরণ এবং বায়ুর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়। সেখানকার স্ত্রী এবং পুরুষেরা বিভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার ফলে, তাদের অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে স্বর্ণের এতই অভাব যে, এখানকার রাষ্ট্র-সরকারগুলি রাজকোষ স্বর্ণ সঞ্চিত রেখে কাগজের টাকা ছাপায়। যেহেতু এই মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক নয়, তাই সেই কাগজের কোন মূল্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষেরা তাদের প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বর্তমান সময়ে মেয়েরা স্বর্ণের পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি গহনা পরছে এবং প্লাস্টিকের বাসনপত্র ব্যবহার করছে, তবুও মানুষ তাদের জাগতিক সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাই এই যুগের মানুষদের মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১০) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত অসৎ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সুমন্দমতয়ঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের বুদ্ধি এমনই বিকৃত যে, অল্প একটু সোনা তৈরি করতে পারে যে প্রবঞ্চক তাকে তারা ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু তাদের কাছে একটুও সোনা নেই, তাই তারা অত্যন্ত দারিদ্র্য এবং সেই জন্য তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

কখনও কখনও এই সমস্ত হতভাগ্য মানুষেরা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভে কোন রকম আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তেরা কখনও কখনও একে স্বর্ণের রঙকে বিষ্ঠার রঙের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন স্বর্ণ অলঙ্কার এবং সুন্দরী রমণীদের প্রতি আকৃষ্ট না হতে। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীম্– স্বর্ণ, সুন্দরী রমণী অথবা বহু অনুগামী লাভের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভক্তের উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করেছেন, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি– "হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাই না।" ভক্ত এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করতে পারেন। সেটিই তাঁর একমাত্র কামনা।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ভগবানের বিনীত ভক্ত কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, 'দয়া করে আপনি আমাকে বিবিধ জড় ঐশ্বর্যপূর্ণ এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করুন।"

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন–

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার॥

তেমনই, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বর্ণমুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারে ভূষিত দেবতাদের স্থিতি আকাশ-কুসুমের মতো অলীক (ত্রিদশপুরাকাশ-পুষ্পায়তে)। ভগবদ্ভক্ত কখনও এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন।

মানব-সমাজের উন্নতি আসুরিক সভ্যতার উপর নির্ভর করে না, যে সভ্যতা কেবল গগনচুম্বী অট্টালিকা আর রাজপথে ছোটাছুটি করার জন্য বড় বড় গাড়ী বানাতে পারে অথচ যার কোন সংস্কৃতি নেই এবং জ্ঞান নেই। প্রকৃতিজাত দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণ। যখন দুধ, দই, মধু, অন্ন, ঘি, গুড়, ধুতি, শাড়ি, শয্যা, আসন এবং অলঙ্কারের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়, তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা বাস্তবিক পক্ষে ঐশ্বর্যবান হন। যখন প্রচুর নদীর জল ভূমিকে প্লাবিত করে, তখন এই সমস্ত বস্তুর উৎপাদন হয় এবং তখন আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু তা নির্ভর করে বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

"সমস্ত প্রাণী অন্নের উপর নির্ভর করে, অন্ন উৎপাদন হয় বৃষ্টি হওয়ার ফলে। বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, এবং যজ্ঞ হচ্ছে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।" এই নির্দেশ ভগবদ্গীতায় (৩/১৪) দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় এই নির্দেশের অনুসরণ করে, তাহলে মানব-সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে।